ছোটদের স্বপ্নের কাগজ

উড়োজাহাজ

পুজো সংখ্যা ২০০২ • কুড়ি টাকা





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

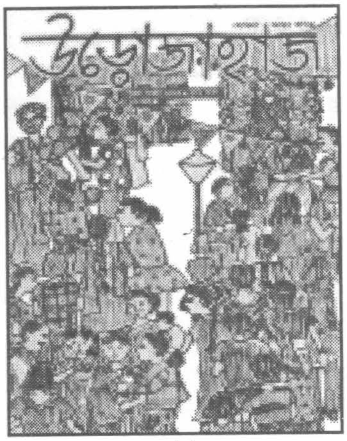
U
and your
Trust
are our
Inspiration

UTI BANK

UTI BANK LTD.
Panihati Extn Counter
Under Nabapally Branch
Panihati Municipality Building
B.T. Road, P. O. - Panihati
24-parganas (N), Pin-743176

উড়োজাহাজের ভেতরে

ছোটদের স্বপ্নের কাগজ



পুজো সংখ্যা ২০০২

কুড়ি টাকা

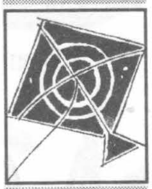
সম্পাদক
সৌম্যেন্দু সামন্ত
তরুণকান্তি বারিক

















গল্প

খেলার গল্প



সামনাসামনি

পরিচালন সমিতি
নিত্যানন্দ আইচ
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
সৃজনী বারিক
নবম শ্রেণী
খালসা মডেল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল

অলংকরণ
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
তরুণকান্তি বারিক

প্রি-প্রেস
সঞ্জীব পাল
দেবাশীষ পাল

জনসংযোগ
জয়া চৌধুরী

দপ্তর
৭৮ মিলন পল্লী, বেলঘরিয়া
কলকাতা ৭০০০৫৬
ফোন ৫৫৩০৮৬১

মুদ্রণ
দিলীপ প্রিন্টিং হাউস
১৪বি শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ২৯

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০০১৬

দপ্তর থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত

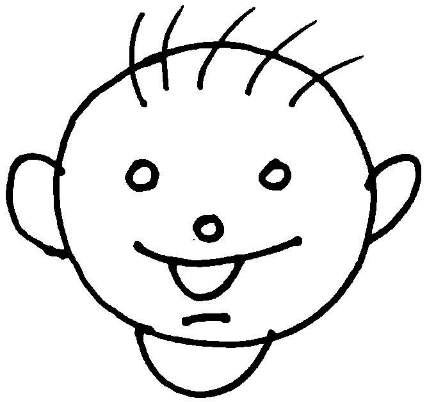









কবিতা ছড়া



আগামী

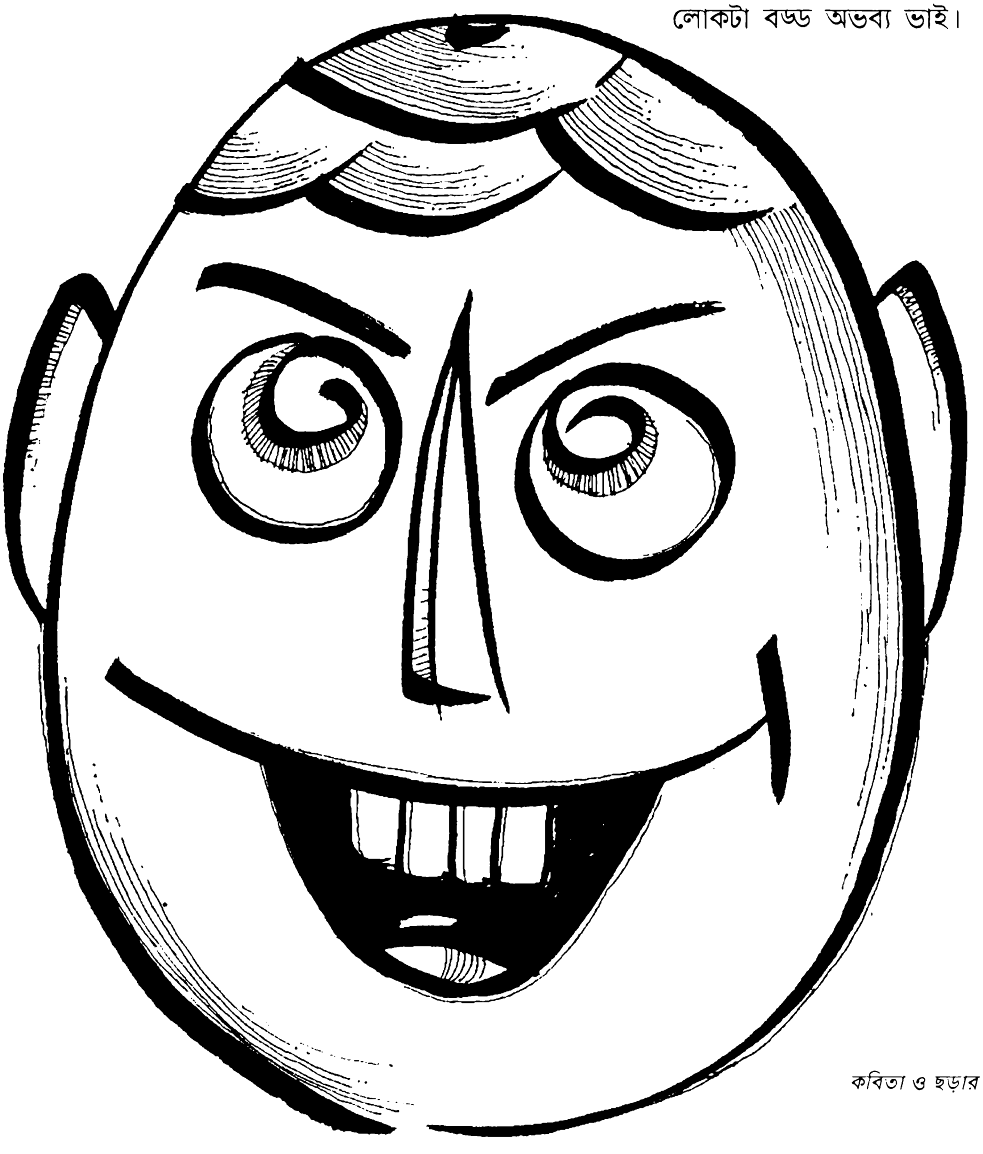
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তালের বড়া

লোকটা বড়ই অভব্য ভাই,
ঘরের দাওয়ায় একলা বসে
ভর্তি করে এক থালা তাই
তালের বড়া খাচ্ছিল সে।

গাঁটের কড়ি খর্চা করে
বাজার থেকে তাল কিনে যে-ই
খাক্ না বড়া নিজের ঘরে,
আমার তাতে আপত্তি নেই।

কিন্তু খাচ্ছে একলা কেন ?
আপত্তিটা জানাচ্ছি তাই।
কেউ দেখিনি হ্যাংলা হেন,
লোকটা বড্ড অভব্য ভাই।



কবিতা ও ছড়ার পাতার ছবি : তরুণকান্তি বারিক

রত্নেশ্বর হাজরা

হালুমবন

গরানগাছে হলুদ ফুল —— কেওড়াপাতা নাচে
সমুদ্দুরের বানের জল হেঁতালপাড়ার কাছে ——
আইল রে জল বইল রে জল —— ডুবল শিকড়গুলো
লবনজলে ডুব দিয়েছে গরানগাছের শূলো।
পাড়া বেড়িয়ে জল চলে যায় —— শূলোর গায়ে কাদা
ঝোঁপের ফাঁকে হালুম ডাকে —— সোঁদরবনের বাদা।
জানিস মিঠু, তুলি
হালুমছানা খায় না কিন্তু ক্ষীরমোহন বা পুলি ——
খায় না পায়েস খায় না পোলাও খায় না বিরিয়ানি
কেউ চেনে না লাট্টু লাটাই দো-আনি চৌ-আনি।
মুখে-ভাত নেই, জন্মদিন নেই, শীতকালে বইমেলা
পুজোর জামা ঈদের পোশাক —— হোলিতে রং-খেলা।
লাল জুতুয়া নীল জুতুয়া কেউ পরে না পায়ে
ঘুম থেকে ওঠ ঘুম থেকে ওঠ রোজ ডাকে না মায়ে।
কেবল পড়ে বনের শব্দ — ঝোপের নড়াচড়া
হালুমছানার করতে হয় না অ-আ-ক-খ পড়া।
মা-বাঘিনী শিকার করে —— একটা ছানা খায়
আর-এক ছানা খেলতে গিয়ে রাস্তা ভুলে যায়।
ছাওয়ালটা খুব দুষ্টু — কিন্তু মিষ্টি ছিল ভারি
এদিক ওদিক সেদিক খোঁজে মাসি পিসির বাড়ি।
জানিস মিঠু, তুলি
হালুমবনের ঠাঁই ঠিকানা সমস্ত জঙ্গুলি।

বনের মধ্যে ছোট্ট নদী —— বাইরে বড়ো বড়ো
ডরায় মাঝি ওপার যেতে মেঘ যদি হয় জড়ো ——
—— বদর-বদর কও মাঝি ভাই — বদর গাজি গাজি—
এক মাঝিরে ডাক দিয়া কয় আর-এক নায়ের মাঝি,
— আউলা বাতাস ঝাউলা বাতাস —— পাল নামাইয়া দ্যাও
এ-বাঁক থেকেই ওপার ধরো সাবধানে নলছ্যাও।
বদর বদর বদর বদর —— বদর গাজি গাজি
পাঁচবার কয় গাহন গাঙের তুফান দেখা মাঝি।

এইদিকে ভয় ঐদিকে ভয় —— তা-ও কি সবাই শোনে!
মধু-র খোঁজে মউলেরা যায় হালিমদেশের বনে ——
সেই কবেকার বনবিবির থান — পুরোনো এক টিবি
বাঘের মুখে আগলে রাখেন জঙ্গলে বনবিবি ——
সকলে তা মানে
তাই পুজো দেয় — মানত করে সে-বনবিবির থানে।
বড়োমিঞা হালুম করে, কেউটেরা ফোঁসায়
বনে রাখেন বনবিবি তো ফাঁকায় দখিন রায়।

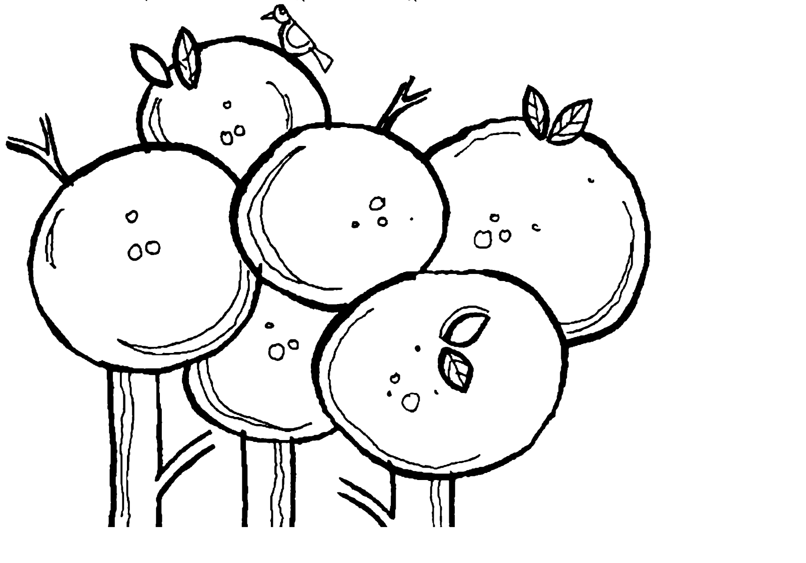
এক-একটা দিন পাড়ার বুড়ো সবাইরে কয় ডেকে —
জঙ্গলে ভাই হাজার বিপদ – পা ফেলে ভাই দেখে
দশ পা গেলেই খাল পড়ে তো বিশ পা গেলেই নদী
এদিক সামাল ওদিক সামাল বানর চেঁচায় যদি।
চেঁচায় কেন বানরগুলো একটু ভেবে দেখো
গাঙ-পেরোনো নতুন বাঘটা শুনছি গুলি-খেকো।
ঘায়েলগুলো ঘের মানে না —— হাউলে বলুক যা-ই
যমের সাথে ঠিক দেখা হয় থাকলেও পরমাই।



গরানডালে হলুদ ফুল
মৌ ভরা মৌচাকে,
হালুমবনের গুলি খেকো
হালুম হুলুম ডাকে।
একটা বাঘের হালুম শুনে
আর-একটা দেয় সাড়া
ঝোপের মধ্যে জুবুথুবু
মাঝের হরিণপাড়া —
ভীষণ ভয়ে দুবলা ছানা
খুঁজতে যাবে মা-কে,
আর-একটা মা জড়িয়ে ধরে
দুধের ছানাটাকে।

এইদিকে বন ঐদিকে বন — হালুমদেশের বাদা
এইদিকে খাল ওদিক নদী — এঁটেলমাটির কাদা।
কখনো ঝড় ঝাপট মারে কখনো যায় ঘুরে
হাজার পাখির দুনিয়াদারি গাছগাছালি জুড়ে।
একটা পাখি ঝাঁকের পাখি – পাখির আকাশ-ওড়া
লম্বা ডালে মানিকজোড় পক্ষী জোড়া জোড়া,
অজগরের নড়ন চড়ন, শঙ্খচূড়ের রাগ
হালুম আসে জলের ধারে —— হালুম থাবার দাগ।

কেওড়াপাতায় ঝিরিক ঝিরি – গোলপাতারা নড়ে
হালুমবনে বাঘ মহারাজ রাজ্যশাসন করে।
কিন্তু মিঠু, তুলি
হালুমবনের নিয়মকানুন সমস্ত জঙ্গুলি—



সরল দে

গয়ং গচ্ছ

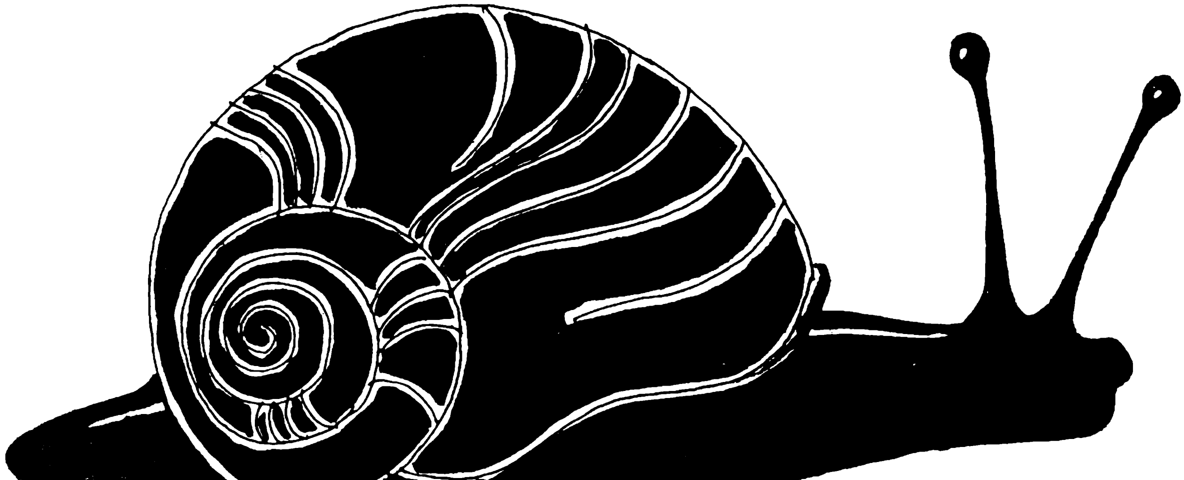
গয়ং গচ্ছ গয়ং গচ্ছ এবং গয়ং গচ্ছ
আউড়ে ভ্রমণমন্ত্র কে ওই যাবে স্বয়ং কচ্ছ ?
কচ্ছে বড় মোচ্ছবে যোগ দিতেই এ সিদ্ধান্ত,
পঞ্জিকাতে নাই লেখা থাক সে ঠিক কিন্তু জানত।

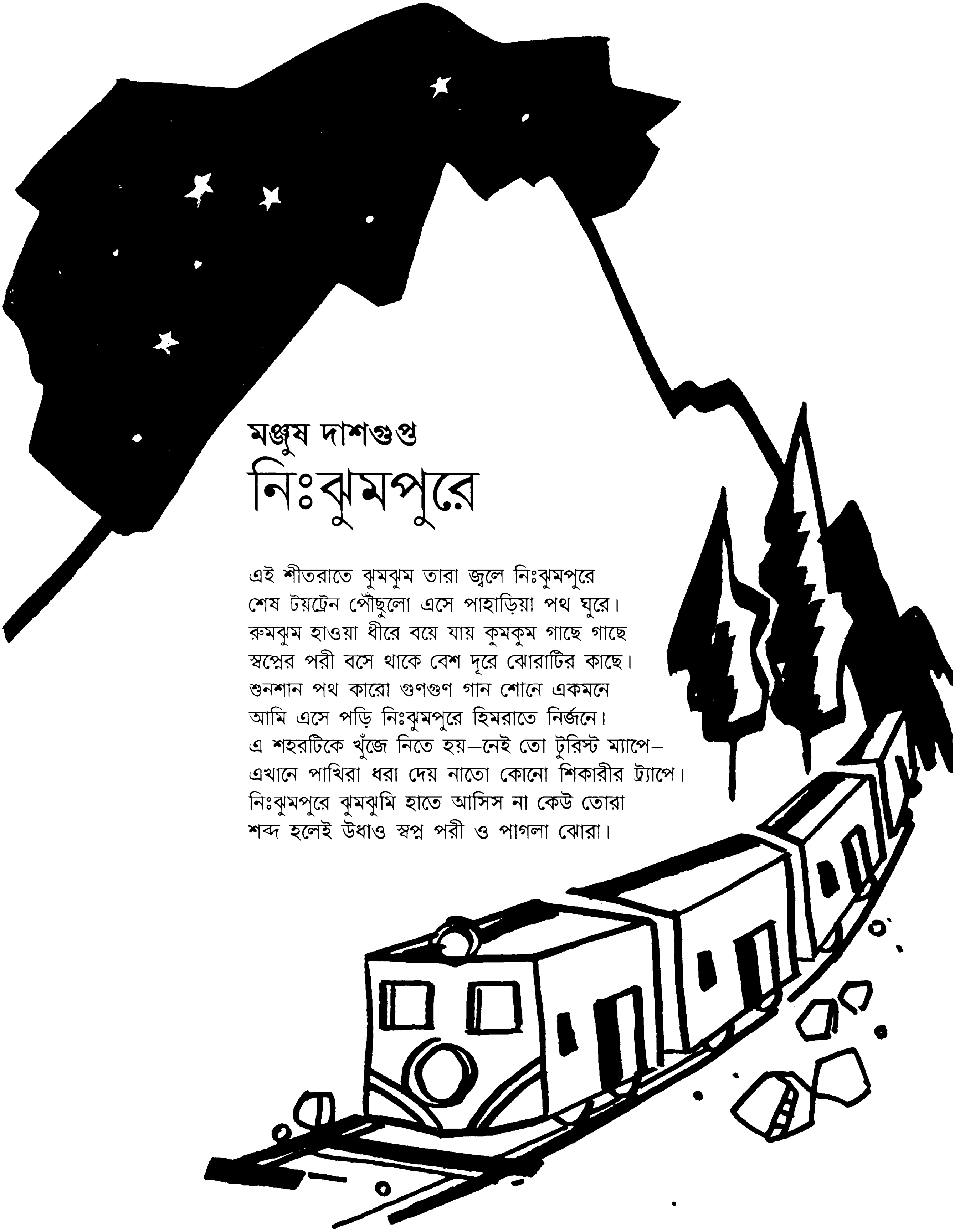
কচ্ছে থেকে দু-একটা দিন যাবে সে কামস্কাটকায়,
বললে, আমি যাবোই যাবো কে আর আমায় আটকায়।
যাত্রা শুরু করবো আমি মুহূর্ত যেই ব্রাহ্ম,
পিছ্‌লে পিছ্‌লে পিছ্‌লে যাবো আমি কি আর থামবো।

বাসা আমার সঙ্গে যাবে ফেলে কি আর যাচ্ছি,
কেউ হেঁচো না যাত্রাকালে হ্যাঁচচো হ্যাঁচচো হাঁচ্‌চি।
বিশ্বভ্রমণ করবো আমি দেখে নানান দৃশ্য,
আমি হচ্ছি, হুঁ হুঁ বাবা, হিউ-এন-সাঙের শিষ্য।

একটা ছাগল ঠ্যাং ছুঁড়তেই শামুক পথে ওল্টায়,
ধুলোয় কিন্তু লুটোয় না সে গুটোয় নিজ খোলটায়।
জপমন্ত্র আউড়ে তখন বললে, হরে কিষ্ট!
খুব বাঁচালে ভাগ্যি আমি হইনি পদপিষ্ট।

বাতাস হলো ফুরফুরে যেই আকাশ হলো স্বচ্ছ
বের করে শুঁড় শামুকটা ফের বলে, গয়ং গচ্ছ।





মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

নিঃঝুমপুরে

এই শীতরাতে ঝুমঝুম তারা জ্বলে নিঃঝুমপুরে
শেষ টয়ট্রেন পৌঁছুলো এসে পাহাড়িয়া পথ ঘুরে।
রুমঝুম হাওয়া ধীরে বয়ে যায় কুমকুম গাছে গাছে
স্বপ্নের পরী বসে থাকে বেশ দূরে ঝোরাটির কাছে।
শুনশান পথ কারো গুণগুণ গান শোনে একমনে
আমি এসে পড়ি নিঃঝুমপুরে হিমরাতে নির্জনে।
এ শহরটিকে খুঁজে নিতে হয়—নেই তো টুরিস্ট ম্যাপে—
এখানে পাখিরা ধরা দেয় নাতো কোনো শিকারীর ট্র্যাপে।
নিঃঝুমপুরে ঝুমঝুমি হাতে আসিস না কেউ তোরা
শব্দ হলেই উধাও স্বপ্ন পরী ও পাগলা ঝোরা।

শ্যামলকান্তি দাশ

হাঁস

হাঁসটা গেল খাবার খুঁজতে সরল মনে,
পুকুর থেকে একটু দূরে বাঁশের বনে।

একটা পাতিশেয়াল ছিল বনের ধারে,
দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁসের ঘাড়ে।

হাঁসটা তখন ছটফটিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,
ফিনকি দিয়ে শুকনো পাতায় রক্ত ছোটে!

হঠাৎ যেন ছটকে গেল তারার মেলা,
রঙ হারিয়ে কাঁদতে থাকে সন্ধেবেলা।

আপনমনে ফিরছিল এক মাছ-ব্যাপারি,
দেখতে পেল বনের হাওয়াবাতাস ভারী।

খলসে-পুঁটি পুকুরজলে ঝিমিয়ে আছে,
বন্ধু কেন আসছে না আর তাদের কাছে!

থমকে আছে গাছের টঙে আকাশখানা,
নিথর হয়ে ঘুমিয়ে আছে হাঁসের ডানা।

রাত্রি যত বাড়ছে মায়ের বুকটা খালি,
করুণ সুরে ডাকছে, 'আ-চই, আয় রে কালি।'

কালি কোথায়? একটি-দুটি শেয়াল ঘোরে,
অন্ধকারে রক্তমাখা পালক ওড়ে!

ছড়াটড়া

এক ছড়া আঁকাবাঁকা
এক ছড়া চৌকো
এক ছড়া ভরা নদী
এক ছড়া নৌকো।

এক ছড়া দাঁড়মাঝি
নৌকোটি বাইছে
এক ছড়া প্রাণ খুলে
ভাটিয়ালি গাইছে।

এক ছড়া বকবক
এক ছড়া মিচকে,
এক ছড়া মহাচোর
এক ছড়া ছিঁচকে।

এক ছড়া জলছবি
এক ছড়া আয়না
দু'জনেই ঘরকুনো
কোথাও যায় না।

এক ছড়া বইখাতা
এক ছড়া ছন্দ,
রোববার দু'জনের
ভাবসাব বন্ধ।

এক ছড়া ফুলগাছ
পিঁপড়ের কুটুস,
শিশিরের ছোঁয়া লেগে
দু'জনেই ফুটুস।





অশোককুমার মিত্র
মনে আঁকা ছবি

লাল নীল হলদে
সাতখানা নৌকো,
ট্যারা-ব্যাঁকা একখানা,
একখানা চৌকো।
বাকি সব সাদা সিধেঃ
রোদ্দুরে গলুই-য়ে
খেপলায় মাছ ধরে,
কেউ ধরে পলুই-য়ে।
ইলিশের ঝলকানি
পুঁটি-চাঁদা-খলসে,
কেউ খায় তেলে ভেজে,
কেউ খায় ঝলসে।
কেউ ছিপে, কেউ জালে
সারাদিন মাছ পায়,
তাই দেখে ডগমগ
হাঁটে বুঝি পাঁচ পায়!
ফুরফুরে মৌতাতে
বকবক রাত দিন,
শুধোলেই কেউ বলে,
বাদ দিন, বাদ দিন।
কেউ বলে, দেখেছেন
খুশিয়াল ঘুড়িটা,
খুশি হলে ডিগবাজি
খায় ঠিক কুড়িটা।
বর্ষার মেঘ ছায়া
জেলে পাড়া ছাড়িয়ে
চলে গেলে ছবি সব
যাবে বুঝি হারিয়ে।

শিবায়ন ঘোষ
গোড়ায় গলদ

দেখছি আমি সমস্তদিন
অঙ্ক কষে কষে
কত কেজি ঘাস চিবুচ্ছে
ছাগল গোরু মোষে

এই যে দেখি চারদিকেতে
পাখিরও কারখানা
বছর বছর খাচ্ছে তারা
কত মটরদানা

হরিণ বলো হাতি বলো
খাচ্ছে কত পাতা
অঙ্ক কষে কষে আমার
উঠল ভরে খাতা

তবুও যদি পেতাম দাদা
সঠিক সমাধানটা,
নিশ্চিন্তে সাঁতার কেটে
করতে যেতাম চান-টা

দাদা বলল, ওরে খোকা
গোড়ায় যে তোর গলদ,
আগে দেখবি কত মোষ
কত গোরু-বলদ!



সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বমামার খুদে বন্ধু

সাপ দেখলে সবচেয়ে ভয় পান বিশ্বমামা, আর সবচেয়ে ভালোবাসেন পিঁপড়ে। একবার শান্তিনিকেতনে একটা সাপ দেখে বিশ্বমামা এমন দৌড় লাগলেন যে...। সাপের জন্য তিনি খোঁড়া হয়ে রইলেন কয়েকটা দিন।

না, তাঁকে সাপে কামড়ায়নি। কিন্তু ভয় পেয়ে দৌড়োতে গিয়ে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন, তাতেই মচকে গেল গোড়ালি।

বড়দের তো দৌড়োবার অভ্যেস থাকে না। তাই তাদের যখন তখন ভয় পেয়ে দৌড়োনো উচিত নয়।

তা ছাড়া সাপ দেখলে দৌড়োলেই বেশি বিপদ। তখন তেড়ে গিয়ে কামড়ে দিতে পারে। চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তারা কিছু করে না।

বিশ্বমামা এত বড় পন্ডিত, তিনি এটা জানেন না?

সেবারে পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে থাকতে বিশ্বমামা বলেছিলেন, হ্যাঁ, জানি, জানি, সবই জানি। তবু সাপ দেখলেই আমার মাথা গুলিয়ে যায়।

সেবারে জার্মানিতে বিশ্বমামার একটা জরুরি মিটিং-এ যাবার কথা ছিল, আর যাওয়াই হলো না।

গত মাসে আমরা পিকনিকে গেলাম কাকদ্বীপে। বিশ্বমামাকে নিয়ে যাবার খুব ইচ্ছে ছিল। বিশ্বমামা গেলে অনেক মজার মজার গল্প শোনা যায়। তা ছাড়া খুব চেপে ধরলে আইসক্রিমও খাওয়ান সবাইকে।

কিন্তু বিশ্বমামাকে সে পিকনিকের কথা বলতেই তিনি আঁতকে উঠে বললেন, ওরে বাবা, কাকদ্বীপ। ওখানে যখন তখন সাপ বেরোয়!

আহা, সাপের ভয়ে কেউ বুঝি কাকদ্বীপে যায় না? কত লোক তো ওখানে থাকে, তারা কি সাপের কামড়ে মরছে?

আমরা দিব্যি পিকনিক করে এলাম, একটাও সাপ দেখিনি।

সেই যে শান্তিনিকেতনে একবার সাপ দেখে পা মচকে ছিলেন, তারপর থেকে আর শান্তিনিকেতনেও যেতে চান না। একমাত্র শীতকাল ছাড়া। শীতকালে সাপ বেরোয় না।

শান্তিনিকেতনে বর্ষাকাল কী সুন্দর। রাস্তায় কাদা জমে না। অজস্র ফুল ফোটে আর অনেক দূর থেকে বৃষ্টি আসছে দেখা যায়। আমাদের মিনু মাসিদের বাড়ি আছে সেখানে, কতবার যেতে বলেন বিশ্বমামাকে, তিনি কিছুতেই যাবেন না।

বিশ্বমামার সাপের ভয় যেমন বেশি বেশি। তেমনি পিঁপড়েদের প্রতি ভালোবাসাও খুব বেশি।

ছোট্ট ছোট্ট পিঁপড়েদের যখন তখন যেখানে সেখানে দেখা যায়। কোথা থেকে যে ওরা আসে, তা বোঝার উপায় নেই। পিঁপড়ে দেখলেই বিশ্বমামা মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকেন।

আমাদের বলেন, দেখেছিস, দেখেছিস, পিঁপড়েরা কী সুন্দর, কী অপূর্ব!

পিঁপড়ে আবার সুন্দর হয় কী করে। তা আমি বুঝি না। ঐ টুকু ঐ টুকু পিঁপড়ে, কামড়ে দিলে বেশ জ্বালা করে।

বিশ্বমামা যে-টেবিলে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে কাজ করেন, একদিন সেই টেবিলের ওপরেই দেখা গেল সারি সারি পিঁপড়ে।

বিশ্বমামা সেগুলো মারলেন না, সরালেন না, কিছু করলেন না, শুধু তাকিয়ে রইলেন আর আমাকে বললেন, বল তো, নীলু, এই পিঁপড়েগুলো এখানে এসেছে কেন?

তা আমি কী করে জানবো? পিঁপড়েরা কেন আসে তা কি কেউ বলতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, কাল আমি এখানে বসে কাজ করতে করতে একটা কেক খেয়েছিলাম। কিছু তো গুঁড়ো টেবিলে পড়বেই। আমি ভালো করে পরিষ্কার করেছি। তবু একটু একটু গুঁড়ো তো টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে থেকে যাবেই। পিঁপড়েগুলো এসেছে সেই টুকরোগুলো খুঁজতে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার না?

পিঁপড়েরা খাবার খুঁজতে আসবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? এ সব পোকা-মাকড় আর জন্তু-জানোয়ারই তো খাবার খুজে বেড়ায়?

বিশ্বমামা বললেন, আমি যে এখানে বসে কাল কেক খেয়েছি, তা পিঁপড়েরা কী করে জানলো? তখন তো এখানে একটাও পিঁপড়ে ছিল না? সব পরিষ্কার করার পরেও যে একটু একটু কেকের গুঁড়ো থেকে যাবে, তাই-ই বা ওরা টের পেল কী করে? কে ওদের খবর দেয়?

অনেক সময় দেখা যায়, একলা একলা একটা পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রকম ভাবে ওরা সব জায়গায় খাবার খুঁজে বেড়ায়। একজন খোঁজ পেলেই অন্যদের ডেকে আনে।

আমার দাদা বিলুর আবার একটা বাতিক আছে।

একদিন একটা ছোট্ট লাল পিঁপড়ে ওর চোখের পাতায় কামড়ে দিয়েছিল সেই থেকে পিঁপড়েদের ওপর ওর খুব রাগ।

পিঁপড়ে দেখলেই ও মারে।

হাত দিয়ে মারে না, জল ঢেলে ঢেলে পিঁপড়েদের নর্দমায় ঢুকিয়ে দেয়। এটা ওর একটা খেলার মতন।

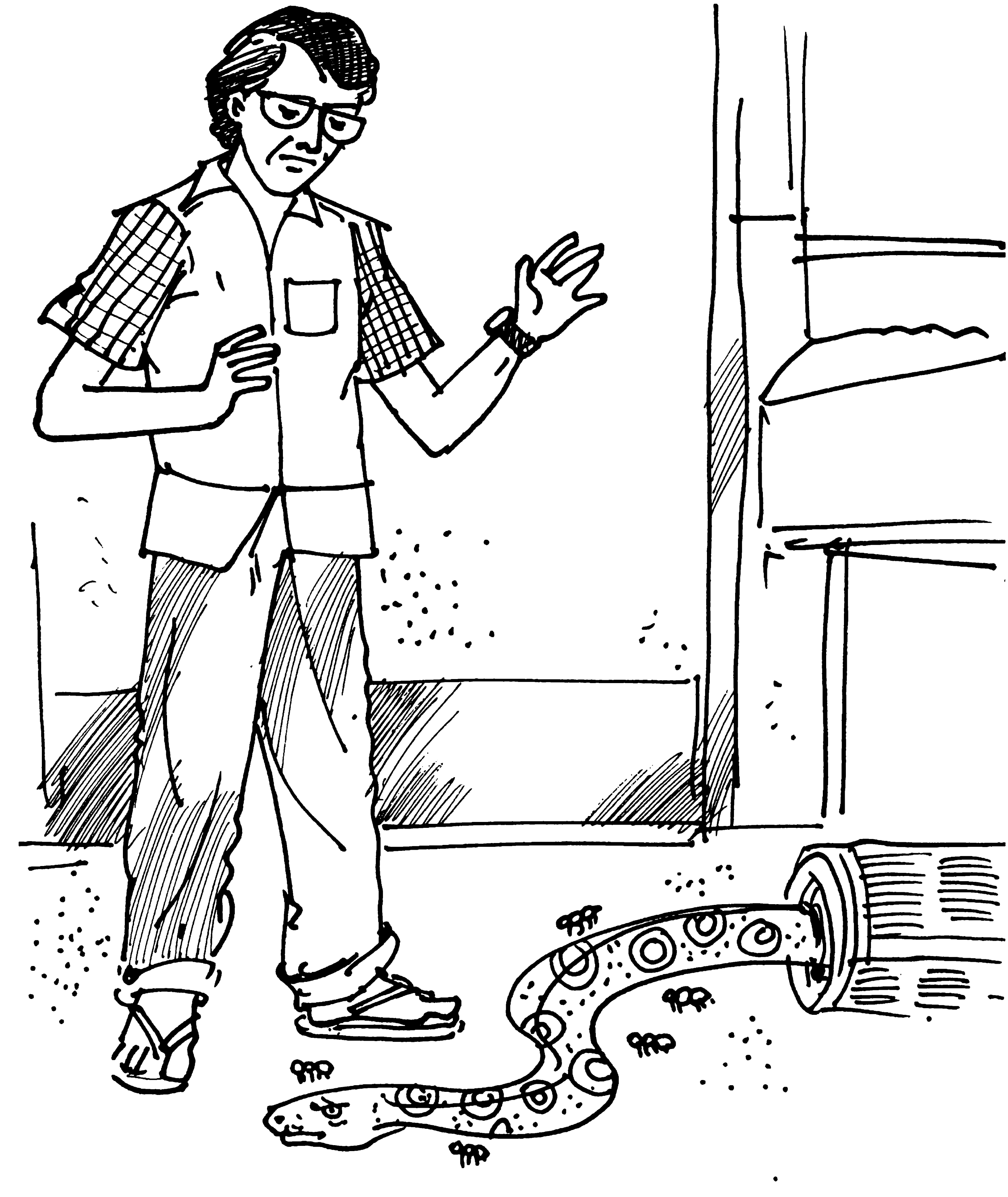
একদিন বিলুদা দেওয়ালে জল ঢেলে ঢেলে পিঁপড়ে মারছিল, তা দেখতে পেয়ে বিশ্বমামার কী রাগ! বিলুদাকে প্রায় মারতে গিয়েছিলেন।

বিশ্বমামা এমনিতে হাসি খুশি মানুষ, সহজে রাগেন না।

সেদিন বললেন, তুই কি করছিস বিলু, তা তুই জানিস? তোর থেকেও বুদ্ধিমান একটা প্রাণীকে তুই মারছিস?

বিলুদা বলেছিল, বিশ্বমামা, তুমি আর বাড়াবাড়ি করো না। মানুষের চেয়ে পিঁপড়ের বুদ্ধি বেশি।

বিশ্বমামা বললেন, নিশ্চয়ই। তোর এত বড় একটা মাথা, তার মধ্যে অনেকখানি ঘিলু মানে ব্রেন আছে। আর পিঁপড়ের মাথাটা একটা আলপিনের ডগার চেয়েও ছোট, তার মধ্যে ইংরিজি ফুলস্টপের চেয়েও ছোট ওর ঘিলু। তাই দিয়েই পিঁপড়ে কতকিছু বোঝে। কী রকম লাইন বেঁধে চলে। সবাই মিলে কাজ করে, নিজেদের মধ্যে কক্ষনো মারামারি করে না। আরও কত গুণ আছে। তা হলে তুলনা করে দ্যাখ!



গল্পের ছবি : গৌতম চট্টোপাধ্যায়

বিলুদা বললেন, কিন্তু আমার চোখের ওপর কামড়াবে কেন? আমার চোখটা কি ওর খাবার জিনিস?

বিশ্বমামা বললেন, সকালে ভালো করে চোখ মুখ ধুয়েছিলি? নিশ্চয়ই কিছু লেগেছিল? আমার চোখে তো পিঁপড়ে কামড়ায় না।

নীলুর চোখে কামড়ায়?

বিশ্বমামা ইচ্ছে করে কেকের গুঁড়ো, বিস্কুটের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখেন ঘরের এক কোণে। সেখানে তো পিঁপড়ে আসবেই। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্বমামা সেই পিঁপড়েদের আনাগোনা দেখেন।

ও গুলো যেন তাঁর পোষা পিঁপড়ে।

মিনু মাসি একদিন এসে বললেন, আমার ছেলের জন্মদিন এবারে শান্তিনিকেতনের বাড়িতে হবে। নীলু, তোদের কিন্তু আসতেই হবে।

আমি আর বিলুদা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

বিশ্বমামা গেলে ভালো লাগতো, কিন্তু উনি তো শান্তিনিকেতনে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

মিনু মাসি বললেন, এখন তো নভেম্বর মাস, শীত পড়ে যাবে। এখন আর বিশ্বর ভয় কি? ওকে বুঝিয়ে বল!

বিশ্বমামার বাড়িতে গিয়ে দেখি, একটা কমপিউটারের সামনে বসে চিঠি পড়ছেন। এখন তো আর বিদেশ থেকে চিঠি পিওন দেয় না। কমপিউটার দেখলেই পাওয়া যায়।

বিশ্বমামা বললেন, ডাক এসেছে, অস্ট্রেলিয়ায় যেতে হবে।

আমি বললুম, এই তো ক'দিন আগে ঘুরে এলে সেদেশ থেকে।

বিশ্বমামা বললেন, একবার গেলে বুঝি আবার যাওয়া যায় না? আগেরবার গিয়েছিলাম নিউজিল্যান্ড।

বিশ্বমামা সত্যিই সারা বিশ্ব টহল দিয়ে বেড়ান। বৈজ্ঞানিক হিসেবে দিন দিন তাঁর নাম বাড়ছে।

শান্তিনিকেতনে যাবার কথা শুনে বললেন, নভেম্বর মাস, ভালো করে শীত তো পড়েনি, এখন ওসব সাপের জায়গায় যাবো না।

আমি বললুম, কলকাতার থেকে শান্তিনিকেতনে আরো আগে শীত আসে। ওখানে এখনই রাত্তিরে কম্বল গায়ে দিতে হয়।

অনেক বলে কয়ে বিশ্বমামাকে রাজি করানো গেল।

অস্ট্রেলিয়ায় যাবার আগে সাতদিন সময় আছে। তার মধ্যে দু'দিন শান্তিনিকেতন।

মিনু মাসির ছেলে বিল্টুকে তিনি ভালোবাসেন খুব। বিল্টু এবার চার বছরে পা দেবে।

তার জন্মদিনের জন্য বিশ্বমামা কিনে ফেললেন একটা এরোপ্লেন। আসল নয়, খেলনা। সেটা কিন্তু ঘরের মধ্যে উড়তে পারে।

মিনু মাসিরা চলে গেলেন আগেই।

আমি আর বিলুদা বিশ্বমামার সঙ্গে গেলুম শনিবার। বোলপুর স্টেশানে নেমে সাইকেল রিক্সা।

মিনু মাসির বাড়ি অনেকটা দূর। বেশ ফাঁকা ফাঁকা জায়গায়।

সে বাড়ির সামনে সাইকেল রিক্সা থামতেই দেখি হুলুস্থুলু কান্ড চলছে।

বাড়ির সামনে বাগানে এক গাদা লোক, তারা উত্তেজিত ভাবে কী যেন বলাবলি করছে।

মিনু মাসিই রয়েছেন সেই ভিড়ের মধ্যে। আমাদের দেখেই কাকে যেন বললেন, এই, এই, বিশ্বকে এখন কিছু বলো না, বলো না!

কিন্তু রমেন মেসো বোধহয় সেটা শুনতে পাননি।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, সাঙ্ঘাতিক কান্ড হয়েছে, ঘরের মধ্যে একটা... ওঃ হো, বিশ্ব, বিশ্ব, না, না, তেমন কিছু নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ঘরের মধ্যে একটা চোর ঢুকে বসে আছে?

বিশ্বমামা গম্ভীর ভাবে বললেন, চোর নয়, সাপ। তাই না?

রমেন মেসো চুপ।

বিশ্বমামা বললেন, আগেই বলেছিলুম, নভেম্বরে শীত পড়ে না। এখন তো রীতিমতন গরম। এই সময় সাপ বেরোয়। আমি আর ও বাড়িতে ঢুকছি না। পরের ট্রেনেই ফিরে যাচ্ছি।

মিনু মাসি দৌড়ে কাছে এসে বললেন, দাঁড়া বিশ্ব। সাপ কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইঁদুর টিঁদুরও হতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, ইঁদুর আর সাপের চেহারা কি এক রকম? কে দেখেছে? মোট কথা, আমি আর থাকছি না এখানে।

মিনু মাসি বললেন, শোন, শোন, তোকে এ বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হবে না। সামনের বাড়িটা খালি। ওটা আমাদেরই এক বন্ধুর বাড়ি। ওটা আমরা নিয়েছি। তুই ও বাড়িতে থাকবি। এখানে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। পুলিশে খবর দিয়েছি।

বিশ্বমামা বললেন, পুলিশ এসে সাপ তাড়াবে? এরকম হাসির কথা জন্মে শুনিনি।

বিশ্বমামাকে নিয়ে যাওয়া হলো উল্টোদিকের বাড়িতে।

আমরা রয়ে গেলাম এই বাগানে।

ঘটনাটা শোনা গেল।

বারান্দায় খেলা করছিল বিল্টু। তাকে পাহারা দিচ্ছিল এ বাড়ির কাজের লোক রঘু।

সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছিল সাপ সাপ বলে।

মিনু মাসি ছুটে এসে কিন্তু কোনো সাপ দেখতে পাননি।

রঘুর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে দু'হাত ছড়িয়ে বসেছিল। এই অ্যাত বড় সাপ। আর একটু হলেই বিল্টুকে কামড়ে দিত।

রঘু চেঁচিয়ে উঠতেই সাপটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

মিনু মাসি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়েও দেখতে পাননি সাপ।

ঘরের মধ্যে একটা খাট, তার তলায় একটা মাদুর গোটানো রয়েছে। সাপটা নাকি ঢুকে বসে আছে ঐ মাদুরের মধ্যে। মস্ত বড় সাপ। ফনা তুলেছিল!

রঘু সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে, তা কী করে বোঝা যাবে?

মিনু মাসি বিল্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই সাপ দেখেছিস?

বিল্টু একগাল হেসে বলেছিল, ছাপ! মস্ত বড়ো ছাপ।

বিল্টু নিজে দেখেছে না রঘুর কথা শুনে বলছে, তা বোঝার উপায় নেই। বিল্টুটা খুব দুষ্টুও হয়েছে।

কিন্তু ঘরে মাদুরের মধ্যে যদি একটা সাপ ঢুকে থাকে, তা হলে তো ও ঘরে ঢোকাই যাবে না! ঐ ঘর দিয়েই অন্য ঘরে যেতে হয়।

সবাই ভেতরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে।

পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা আসবে কেন? তারা চোর ডাকাত ধরারই সময় পায় না।

শান্তিনিকেতনে সাপুড়েও নেই।

সুরুলে নাকি একজন লোক সাপ মারায় ওস্তাদ, একজন লোক গিয়েছিল তাকে ডেকে আনতে।

লোকটি ফিরে এসেছে। সাপ-মারা লোকটির দারুণ জ্বর,

সে আসতে পারবে না।

তা হলে উপায়?

বিশ্বমামাকে গিয়ে সব ঘটনা জানালাম।

বিশ্বমামা বললেন, আমি ও বাড়ির ধারে কাছেও আর যাচ্ছি না। মিনুদিকে বল, সবাই মিলে এ বাড়িতে চলে আসুক।

কিন্তু ঐ ঘরেই যে অন্নপ্রাশনের সব জিনিসপত্র রয়েছে।

বিশ্বমামা বললেন, বিকেলবেলা ফেরার ট্রেন কখন রে?

এবারে বিলুদা বললো, বিশ্বমামা, তুমি সাপের নাম শুনে কাপুরুষের মতন পালিয়ে যাবে? ঐ ঘরের কাছাকাছি না যাও, একটা কিছু বুদ্ধি দাও!

বিশ্বমামা বললেন, যারা সাপ তাড়াবার জন্য পুলিশ ডাকে, তাদের আমি কী বুদ্ধি দেব?

আমি বললুম, গ্রামে তো আজকাল সাপের ওঝাও পাওয়া যায় না। তাহলে কি ডাক্তার ডাকতে হবে?

বিলুদা বললেন, দূর বোকা? সাপে কামড়ালে ডাক্তাররা চিকিৎসা করে, ডাক্তাররা কি সাপ ধরে নাকি? ডাক্তাররাও সাপ দেখলে ভয় পায়–

বিশ্বমামা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, সাপের জন্য পুলিশ, ডাক্তার, এবার কি বলবি মন্ত্রী ডাকার কথা!

তারপর বললেন, শোন–

বিল্টু চলে এসেছে এ ঘরে। কী যেন খাচ্ছিল, সে হাতটা চাটছে এখনো।

বিশ্বমামা আমাদের শুধু শোন বলে থেমে গেলেন। বিল্টুকে কাছে ডেকে আদর করতে করতে বললেন, কী খাচ্ছিস রে, বিল্টু।

বিল্টু বললো, চিনি, চিনি!

বিশ্বমামা বললেন, আহা রে, খিদে পেয়েছে বুঝি? তোকে কেউ চকলেট দেয়নি, সন্দেশ দেয়নি। শুধু চিনি খাচ্ছিস! আমি বিকেলে বেরিয়ে চকলেট কিনে দেব।

আমি বললুম, বিশ্বমামা, তুমি কী বলছিলে যেন?

বিশ্বমামা বললেন, সাপটারও খিদে পেয়ে থাকতে পারে। ওকেও কিছু খাবার দেওয়া উচিত।

বিলুদা বললো, সাপেরা কী খায়? দুধ আর কলা।

বিশ্বমামা বললেন, ওটা বাজে কথা। কে রটিয়েছে কে জানে! সাপ দুধও খায় না, কলাও খায় না। ওরা কোনো রকম ফল খেতে পারে না। দুধও চেটে খাবার ক্ষমতা সাপের নেই।

তবে কী খাবে?

বিশ্বমামা বিল্টুর নকল করে বললেন, চিনি, চিনি।

তারপর বললেন, সাপটাকে এক বাটি চিনি খাওয়াতে পারবি? মিষ্টি খেতে সবাই ভালোবাসে।

বিলুদা বললো, সাপকে কী করে চিনি খাওয়াবো? কাছে গেলেই তো কামড়ে দিতে পারে।

বিশ্বমামা বললেন, কাছে যেতে হবে কেন? একবাটি চিনি জোগাড় করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সবটা চিনি ছুঁড়ে দে মাদুরটার ওপর। যা, এক্ষুণি গিয়ে ব্যবস্থা কর। কী হলো আমাকে এসে জানাবি।

দৌড়ে গিয়ে মিনু মাসিকে কথাটা জানাতেই তিনি বললেন, সাপ চিনি খায়, জন্মে শুনিনি। তা ছাড়া, খেতে টেতে দিলে ও তো আরও বেরুতে চাইবে না।

আমি বললুম, তবু, বিশ্বমামা বলেছেন যখন!

মিনু মাসি আর আপত্তি করলেন না। মানুষটা যে খুব জ্ঞানী, তা তো সবাই জানে।

বিশ্বমামা কী ভেবে কোন্ কথাটা বলেন, তা আগে বুঝতে দেন না।

রমেন মেসো নিজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবাটি ভর্তি চিনি ছুঁড়ে দিলেন মাদুরটার ওপর।

কিছুই হলো না। মাদুরটায় কোনো নড়াচড়াও টের পাওয়া গেল না।

কেউ কেউ বললো, বাজে কথা, সাপ টাপ কিছু ঢোকে নি।

আর কেউ কেউ বললো, ঢুকলেও তা হয়তো বেরিয়ে গেছে আবার কোন ফাঁকে।

কেউই কিন্তু সাহস করে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাদুরটা টেনে দেখতে চাইছে না।

বিশ্বমামা চিনি ছোঁড়ার কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। দু'ঘন্টা অপেক্ষা কর। আর দু' একজন দরজার কাছে পাহারায় থাকুক। যদি মাদুরের মধ্যে সাপটা লুকিয়ে থাকে, তাহলে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সাপটা বেরিয়ে আসতে বাধ্য।

রমেন মেসোর সঙ্গে আমি আর বিলুদা রইলুম দরজার কাছে পাহারায়।

সত্যি সাপটা ওখানে আছে কি নেই, তা না জেনে কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যাবে না।

রমেন মেসোর হাতে একটা লোহার ডান্ডা, আমার আর বিলুদার হাতে লাঠি।

বিল্টুও এখানে আসবেই আসবে, তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে অন্য বাড়িটায়।

দু' ঘন্টাও লাগলো না।

তার আগেই মাদুরটায় একটু নড়া চড়া শুরু হলো। তারপর খুব জোরে ওলোট পালোটের মতন।

তারপর সড়াৎ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো একটা মস্ত বড় সাপ।

সাপটা তারপর আর এগোতেই পারছে না। এমনভাবে একবার এদিক আর একবার ওদিক করছে, যেন অন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা লক্ষ করিনি, কখন যেন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে রাশি রাশি পিঁপড়ে। কোথায় এত পিঁপড়ে থাকে কে জানে।

চিনির জন্য এত পিঁপড়ে এসে জুটেছে, সাপটার সারা শরীরও ঢেকে গেছে পিঁপড়েতে।

যে সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, সে সাপও পিঁপড়েদের কাছে অসহায়।

বেচারি সাপটাকে আর মারতেও হলো না। সে অত পিঁপড়ের কামড়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

রঘু সবটা সত্যি বলেনি। ও সাপটা বেশ বড় বটে, কিন্তু মোটেই ফনা তুলতে পারে না। বিষাক্তও নয়।

অনেকেই বললো, ওটা একটা দাঁড়াস সাপ, ওকে মেরে লাভ নেই। ওরা ব্যাঙ আর পোকা মাকড় খায়, মানুষকে সাধারণত কামড়ায় না। কামড়ালেও মানুষ মরে না।

রমেন মেসো তাঁর ডান্ডার ডগায় সেটাকে তুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে এলেন অনেক দূরে।

সব শুনে বিশ্বমামা বললেন, দেখলি, দেখলি, কেন আমি পিঁপড়েদের এত প্রশংসা করি? ওরা আমার বন্ধু।

অপূর্ব দত্ত

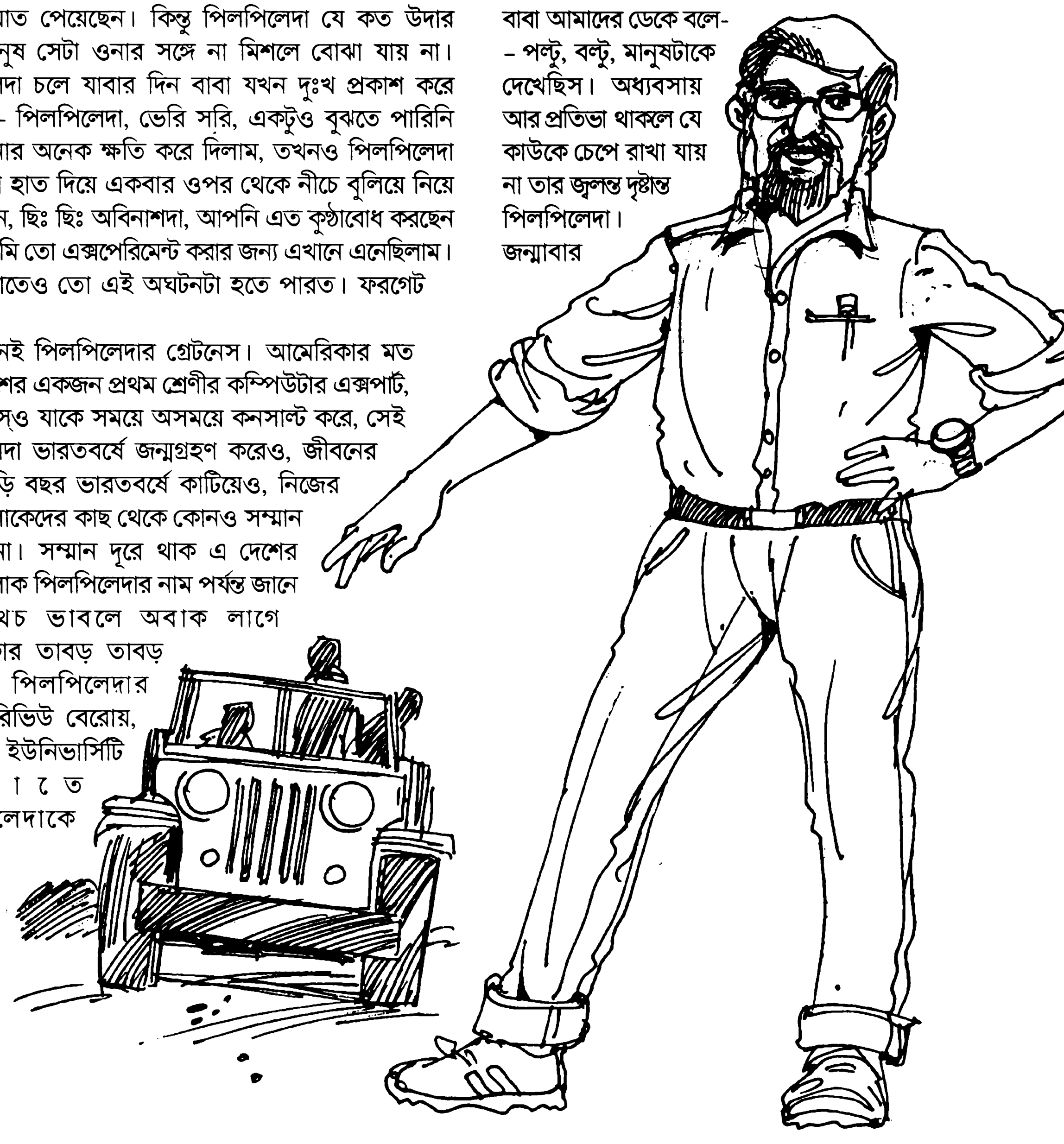
পিলপিলেদা ও ডিজিটাল ক্যামেরা

পিলপিলেদা যে এত অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার আসবেন সেটা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। এক মাসও হয়নি পিলপিলেদা এই দেশ থেকে ঘুরে গেলেন। যন্ত্রমানব রমেশ সেনকে নিয়ে ঘুরে যাবার সময় কুট্টি বলেছিল, পিলপিলেদা, এবারে রমেশদাকে তো বাবা জুতোর বুরুশ দিয়ে আঘাত করেছিল বলে ওর মাথার চিপ ডিসব্যালান্সড হয়ে গিয়েছিল, সে জন্য সামনের বার যখন ইন্ডিয়াতে আসবেন তখন যেন একটা ভাল দেখে যন্ত্রমানব তৈরি করে নিয়ে আসেন। তখনও পিলপিলেদা উদাসীনভাবে সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে শুধু 'দেখি' বলেছিলেন। আসলে পিলপিলেদার প্রথম যন্ত্রমানব আবিষ্কারটা এরকমভাবে বাবার অসাবধানতায় অকেজো হয়ে গিয়েছিল বলে আমরা ভেবেছিলাম যে পিলপিলেদা হয়তো মনে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু পিলপিলেদা যে কত উদার মনের মানুষ সেটা ওনার সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না। পিলপিলেদা চলে যাবার দিন বাবা যখন দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল– পিলপিলেদা, ভেরি সরি, একটুও বুঝতে পারিনি যে আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলাম, তখনও পিলপিলেদা দাড়িটা বাঁ হাত দিয়ে একবার ওপর থেকে নীচে বুলিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, ছিঃ ছিঃ অবিনাশদা, আপনি এত কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন। আমি তো এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এখানে এনেছিলাম। আমার হাতেও তো এই অঘটনটা হতে পারত। ফরগেট প্লিজ।

এইখানেই পিলপিলেদার গ্রেটনেস। আমেরিকার মত উন্নত দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কম্পিউটার এক্সপার্ট, বিল গেটস্‌ও যাকে সময়ে অসময়ে কনসাল্ট করে, সেই পিলপিলেদা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেও, জীবনের প্রথম কুড়ি বছর ভারতবর্ষে কাটিয়েও, নিজের দেশের লোকেদের কাছ থেকে কোনও সম্মান পেলেন না। সম্মান দূরে থাক এ দেশের অনেক লোক পিলপিলেদার নাম পর্যন্ত জানে না। অথচ ভাবলে অবাক লাগে আমেরিকার তাবড় তাবড় জার্নালে পিলপিলেদার ছবিসহ রিভিউ বেরোয়, বড় বড় ইউনিভার্সিটি গুলোতে পিলপিলেদাকে লেকচার দিতে ডাকা হয়, ইউ. এন. ও সহ বড় বড় কনফারেন্সও সেমিনারে পিলপিলেদাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। শুধু আমেরিকা কেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, গ্রেটব্রিটেন, কানাডা এ সব দেশেও পিলপিলেদার কত নাম, কত সম্মান প্রতিপত্তি খ্যাতি। পিলপিলেদার অবশ্য এ জন্য কোনও আক্ষেপ নেই। বরং আমরা জানতে চাইলে খুব বিনয়ের সঙ্গে হেসে বলেছেন– তোদের ভারতবর্ষে নিশ্চয় আমার থেকে যোগ্যতর লোক আছে, সেইজন্যই আমার প্রয়োজন নেই বলে লোকে ডাকে না। তবে যদি তোদের ভারত সরকার আমাকে ডাকে, যদি তোদের ভারতবর্ষের, তোদের পশ্চিমবাংলার কোনও কাজে কখনও নিজেকে লাগাতে পারি তবে ধন্য মনে করব।

পিলপিলেদার এই বিনয় দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। বাবা আমাদের ডেকে বলে-

– পল্টু, বল্টু, মানুষটাকে দেখেছিস। অধ্যবসায় আর প্রতিভা থাকলে যে কাউকে চেপে রাখা যায় না তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পিলপিলেদা। জন্মাবার



পরেই যে বাবা-মাকে হারিয়ে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত অন্যের দ্বারা পালিত হয়েছে, লেখাপড়া দূরে থাক, চায়ের দোকানে কাপ-ডিস ধুয়ে, চালের দোকানে মুটে-গিরি করে, লোকের বাড়ি বাড়ি ধূপকাঠি আর আচার বিক্রী করেও যে মানুষ জগদ্বিখ্যাত হতে পারে, তার মহানুভবতা বা গ্রেটনেস ভেজাল আছে এ কথা কোনও শত্রুও বলবে না।

বাবার কথা একশোভাগ খাঁটি। বাবা আরও বলে– দেখ, আমাদের দেশ ওনার কৃতিত্বকে স্বীকার না করাতে ওনার কোনও ক্ষতি হয়নি। উনি ঠিকই সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু বাইরের জগতের কাছে, পৃথিবীর অন্য দেশের কাছে আমরাই নিজেদের কত ছোট ক'রে ফেলেছি।

আমরা নিজেদের মধ্যে, মানে আমাদের ভাইবোনেদের মধ্যেও এ নিয়ে কত আলোচনা করেছি। কুট্টি সেদিন বলল– দাদা, দেখেছিস, পিলপিলেদার ওয়েব সাইটে ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কত ভাল ভাল তথ্য দেওয়া আছে। ভারতের বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে কত প্রশংসা লেখা আছে। আর পশ্চিমবাংলার লোকজন সম্বন্ধে তো কতই।

পিলপিলেদার দেশপ্রেম যে কত বড় মাপের তা ওনার ওয়েব সাইট আর ই-মেল অ্যাড্রেস দেখলে বোঝা যায়। পিলপিলেদার ওয়েব সাইটের নাম– 'ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ পিলপিলে ইন্ডিয়া ডট নেট ডট ইন'। আর ই-মেল অ্যাড্রেস হল 'বাঙালি পিলপিলে অ্যাট এওএল ডট কম' (Bangalipilpile@aol.com)। পিলপিলেদা মুখে যতই 'তোদের ভারতবর্ষ', 'তোদের পশ্চিমবাংলা' বলুন না কেন অন্তরে যে উনি হানড্রেড পার্সেন্ট ভারতীয় আর টু হান্ড্রেড পারসেন্ট বাঙালি সেটা ওনার ওয়েবসাইট আর ই-মেল অ্যাড্রেস দেখলেই বোঝা যায়।

এবারে পিলপিলেদার আসাটা একদম অভাবিত, অপ্রত্যাশিত। অন্যান্যবার আগের থেকে খবর দেন, হয় ই-মেল পাঠান, না হয় ফোন করেন। এ বারে একদম সারপ্রাইজ। কাল রাত্রে যখন টিভিতে 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠান দেখছিলাম তখনই ফোন এল। বাবা ধরে কথা বলল। তারপর বলল– পিলপিলেদা ফোন করেছিলেন। ইউনেসকোর একটা সেমিনারে যোগ দিতে এসেছেন। কাল বিকেলে ল্যান্ড করেছেন। তাজ বেঙ্গলে উঠেছেন। অফিসিয়াল প্রোটোকল। সঙ্গে দশ বারো জনের টিম আছে। কাল সকালে আসবেন হিং-য়ের কচুরি আর খেজুর গুড়ের পাটালি খেতে। ও হ্যাঁ, এখান থেকে এক হাঁড়ি জয়নগরের মোয়া নিয়ে যাবেন। আমাকে কিনে রাখতে বললেন।

দাদা বলল– আমাদের বাড়িতে না এসে হোটেলে উঠলেন কেন? কিছু বললেন?

– হ্যাঁ, বললেন যে উনি এই সেমিনারটাতে ইউ.এস. গভর্নমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করছেন। ওঁদের অফিসিয়াল ম্যান্ডেট আছে টিমের সঙ্গে থাকতে হবে। আসলে আমার মনে হয় কি জানিস বল্টু, এগারই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর থেকে বুশ সরকার আর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

ছুট্টি বলল– যাক গে দাদা, পিলপিলেদার নিশ্চয় অসুবিধা আছে বলে বা বাধ্য হয়েছেন বলে হোটেলে থাকতে হচ্ছে। কাল সকালে তো আসছেন। তখন না হয় চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। কম্পিউটারটাও দেখিয়ে নেওয়া যাবে। আজ সাত দিন হল কম্পিউটারটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। ই-মেল পাঠাতে পারছি না। কে জানে পিলপিলেদা হয়তো ই-মেল পাঠিয়েছেন, আমরা খুলতে পারিনি।

– ঠিক বলেছিস। খুব ইমপর্টান্ট কথাটা মনে করিয়েছিস। কম্পিউটারটা দেখিয়ে নেব। তবে আমাদেরও ভুল হয়েছে। কোনও সাইবার কাফেতে গিয়ে ই-মেল চেক করে আসতে পারতাম।

ছোটকা অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এতক্ষণ চুপ করে থাকাটা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা তো আতঙ্কে ছিলাম এই বুঝি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে। তবু বাঁচোয়া বাইরের লোক কেউ নেই।

ছোটকা বলল– হ্যাঁরে বল্টু, আমাদের পাড়ার মোড়ে নিস্তারিণী কাফে রয়েছে, বাজারের মধ্যে ভূপতি কাফে রয়েছে, সেখান থেকে করা যায় না?

আমরা হাসব কি কাঁদব বুঝে পেলাম না। ছোটকার মগজে সত্যি সত্যিই একবিন্দু ঘিলু নেই, তা না হলে সাইবার কাফে আর নিস্তারিণী কাফে-র তফাৎ বুঝতে পারে না।

কুট্টি বলল– নিস্তারিণী কাফে, ভূপতি কাফে এগুলো তো চা-বিস্কুটের দোকান। আর সাইবার কাফে হল কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংক্রান্ত কাজ করা যায় এরকম একটা সেন্টার। তুমি সাইবার কাফের নাম শোননি? সাইবার কথাটার অর্থ জান না?

ছোটকাকা ভুল বুঝতে পেরে চুপ করে গেল।

পরের দিন সকালে সবাই তাড়াতাড়ি উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নিলাম। একটু পরেই পিলপিলেদা এসে পড়বেন। আমরা সবাই ঠিক করে নিয়েছি যে পিলপিলেদা এলে বলব আমাদের নিকো পার্ক বা মিলেনিয়াম পার্ক দেখাতে নিয়ে যেতে।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়িতে সাধারণত গাড়ি নিয়ে কেউ আসে না। পিলপিলেদা এর আগে যতবার এসেছেন ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন। আমরা সবাই, ছোট্‌কা, এমনকি বাবা মা-ও গাড়ির আওয়াজ শুনে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। ছোটকা নিজের মনেই বলে উঠল– কী সুন্দর গাড়িটা দ্যাখ। স্টুডিবেকার।

ছোটকা যখন যেটা বলে আগাপাশতলা না ভেবে খুব কনফিডেন্টলি বলে। দাদা রেগে উঠে বলল– তোমার মাথা আর মুন্ডু। সব ব্যাপারে তোমার কথা বলা চাই-ই। কলকাতায় এখন স্টুডিবেকার গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়? তার ওপর এই রকম ঝাঁ চকচকে। এটার নাম টয়োটা কোয়ালিস।

– কোয়ালিটিস তো আইসক্রিমের কোম্পানি। সেটা কি টয়োটা কোম্পানি কিনে নিয়েছে?

বাবা এবারে ভীষণ জোরে ধমক দিয়ে বললেন– যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন? কোয়ালিস আর কোয়ালিটিস এক হল? মুখ্যু গবেট কোথাকার।

পিলপিলেদা গাড়ি থেকে নামলেন। এবারে আর জিনসের জ্যাকেট, জিনসের প্যান্ট বা হান্টার শু নেই। একেবারে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাক। কোট প্যান্ট টাই পরে গটমট করে হাঁটছেন। বাবা এগিয়ে গিয়ে সাদরে নিয়ে এলেন।

হিংয়ের কচুরি, কড়াইশুঁটি দেওয়া আলুরদম আর পাটালিগুড়

দিয়ে জলখাবার খেতে খেতে অনেক গল্প। মা পিলপিলেদার জন্যে স্পেশাল করে নলেনগুড় দিয়ে পায়েস রান্না করেছে।

পিলপিলেদা বলল– সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলাটা তো একটা সাংঘাতিক কান্ড। সিকিওরিটি স্টাফ খুব টাইমলি অ্যাকশন নিয়েছে। না হলে কী যে হত কে জানে। চতুর্দিকে এখন সবাইকে অ্যালার্ট থাকতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের ভাব জাগিয়ে তুলতে না পারলে শুধু সিকিওরিটি স্টাফ দিয়ে কিছু হবে না। আমাদেরও সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে সমস্ত কিছুর ওপর, বিশেষ করে, সরকারী বাড়িগুলো, গবেষণাগার, পাবলিক ইউটিলিটি উপকরণ, গাড়ি ইত্যাদির ভালভাবে দেখভাল করা উচিত। তোরাও সব সময় খুব কশাসলি চলাফেরা করবি। ইনফ্যাক্ট, দেশের মধ্যে সব জায়গায় সন্ত্রাসবাদীদের চর ঘোরা ফেরা করছে। আজকাল শুনছি তোদের ভারতবর্ষে দেদার আর্মস পাওয়া যাচ্ছে। পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণের কথা আমরা ওদেশের পত্রপত্রিকায় দেখেছি। আর, আর.ডি.এক্স তো এখন শুনছি আটা ময়দার মত পাওয়া যাচ্ছে।

– আচ্ছা পিলপিলেদা, আর. ডি. এক্স-এর পুরো কথাটা জানেন? ওটা দিয়ে কী হয়?

ছুট্টির কথা শুনে পিলপিলেদা মুচকি হেসে বললেন– তা, একটু আধটু জানি বইকি। ওর ফুল ফর্ম হল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এক্সপ্লোসিভ। খুব শক্তিশালী ডিটোনেটর। এসব জিনিস সিভিলিয়ানদের কাছে থাকার কথা নয়।

বাবা ফিসফিস করে মা-র কানে কানে বলল– দেখেছ, দেশের জন্যে ওর কত চিন্তা। কত ভাবে। অথচ আমাদের দেশ ওর প্রতিভার দাম দিল না। তবে আমার বিশ্বাস একদিন না একদিন দেবেই।

কথার মাঝখানে খবরের কাগজওলা কাগজ দিয়ে গেল। আজ নাকি কী কারণে কাগজ আসতে অনেক দেরি হয়েছে। বাবা এক নজর কাগজটা দেখেই বলল– ওরে, এই দেখ, পিলপিলেদার কথা লিখেছে– প্রবাসী ভারতীয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পিলপিলে মুখার্জির নতুন আবিষ্কার।

আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম কাগজটার ওপর। পিলপিলেদা বলল– কাল সন্ধেয় হোটেলে প্রেস কনফারেন্স ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে অনেক লোক ইনভাইটেড ছিলেন। প্রেসের লোক অনেকক্ষণ ইন্টারভিউ নিয়েছে।

বাবা বলল– তা হলে আর আপনার কোনও দুঃখ নেই। এখন থেকে নিশ্চয় আর 'তোদের ভারতবর্ষ', তোদের পশ্চিমবঙ্গ বলবেন না।

পিলপিলেদা শুধু হাসলেন। তারপর বললেন– তোদের কম্পিউটার কেমন চলছে? কী কী শিখলি? প্রোগ্রামিং না শিখলে কিন্তু কম্পিউটারের সি-ও শিখলিনা। দুটো চিঠি লেখা, দুটো ই-মেল পাঠানো এগুলো কিন্তু কোনো কাজই নয়। এগুলো গাধার কাজ।

দাদা সুযোগ বুঝে কথাটা পাড়ল। বলল– পিলপিলেদা, আমাদের কম্পিউটারটা ক'দিন হল কাজ করছে না। একটু দেখে দেবেন।

– ভাইরাস নয় তো? তোদের ভাইরাস স্ক্যানার আছে তো? চল দেখি।

ছোটকা আবার বোমা ফাটাল। সিরিয়াস সিরিয়াস মুখ করে বলল– তার মানে পিলপিলেদা, কম্পিউটারের অসুখ করেছে? জ্বর হয়েছে? ভাইরাস অ্যাটাক হলে তো রোগজীবাণু হয়।

– পিলপিলেদা খুব জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন- – না রে পাগল। এটা সেই ভাইরাস নয়। তবে তুমি পার্টলি কারেক্ট। ভাইরাস দু'রকমের হয়। একটা বায়োলজিকাল, যেটা লিভিং জিনিসের মধ্যে সংক্রামিত হয়, আর একটা নন-বায়োলজিকাল। কেন, রিসেন্টলি আমেরিকায় অ্যানথ্রাক্সের ভাইরাস আক্রমণ নিয়ে কত তোলপাড় হয়ে গেল, ভুলে গেলে? কম্পিউটার ভাইরাস হল নন-বায়োলজিকাল। নে পল্টু, কম্পিউটারটা চালা।

কম্পিউটারের সামনে বসে পিলপিলেদার ভুরু কুঁচকে গেল। নিজের মনে বলে উঠলেন– সর্বনাশ হয়ে গেছে। হার্ড ডিস্কের বারোটা বেজে গেছে। একটা ফাইলও রিট্রিভ করা যাচ্ছে না। তোরা করেছিস কী? একটাও অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়ার রাখিসনি। খুব ভুল করেছিস।

দাদা জিগ্যেস করল– ভাইরাস জিনিসটা কী পিলপিলেদা? কীভাবে ক্ষতি করে?

– সে এক বিশাল সাবজেক্ট। এত অল্প কথায় বলা যাবে না। আর একদিন বুঝিয়ে দেব আর নোটস দেব। খুব সংক্ষেপে জেনে রাখ, ভাইরাস হল একটা প্রোগ্রাম যার দ্বারা কম্পিউটারের মধ্যে ওয়ার্ম বা পোকার আক্রমণ হয়। সকলের অজান্তে ওরা কম্পিউটারের সব ফাইল নষ্ট করে দেয়। ভীষণ ফাস্ট ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্যই তো অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম লাগাতে হয় যেটা বুটিং-য়ের সময় ভাইরাস স্ক্যান করে। কোনও ব্যাড সেক্টর আছে কিনা বলে দেয়। অনেক রকমের ভাইরাস আছে। তাদের বিভিন্ন রকম ফাংশন। নানাভাবে এই ভাইরাস আক্রমণ হতে পারে। ইন্টারনেট মারফৎ, ফ্লপি থেকে, ডিস্ক থেকে। আচ্ছা তোরা কি আননোন মেল-টেল খুলেছিলি।

দাদা বলল– হ্যাঁ, একদিন দেখি আমার নামে কিছু ই-মেল এসে পড়ে আছে। কে বা কারা পাঠিয়েছে বুঝলাম না। ই-মেল আইডি টা আমার অজানা। তার ওপর...



– বুঝেছি। ওদের কাজই হল এইভাবে ঢুকে পড়া। যা করেছিস করেছিস। কোন অজ্ঞানা মেল কখনও খুলবি না। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিবি। আমি দু'একটা অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল করে দিচ্ছি। হার্ডডিস্কে কোনও পার্টিশনও করিসনি। একটা ড্রাইভেই সব ফাইল ডাম্প করেছিস।

ছুট্টি একটা ছোটকার মত কথা বলে ফেলল। ছুট্টি বলল– কী দিয়ে পার্টিশন করবেন পিলপিলেদা? পিচবোর্ড দিয়ে, না প্লাইবোর্ড দিয়ে?

পিলপিলেদা বললেন– সব ভুলে গেছিস। কম্পিউটার অ্যাসেম্বেল করার সময় সংক্ষেপে সি.পি.ইউ আর হার্ডডিস্কের ফাংশন বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যেই ভুলে গেলে চলবে? কম্পিউটার কি পিচবোর্ড বা প্লাইবোর্ডের ব্যবহার বোঝে? হার্ড ডিস্কের পার্টিশন হল লজিক্যাল পার্টিশন। ফাইল ফোল্ডার স্টোর করার জন্য কতগুলো আলাদা আলাদা ড্রাইভ ভাগ করে নিতে হয়। তার ফলে ফাইল চিনতে বা খুঁজতে কম্পিউটারেরও সুবিধা হয়, আমাদেরও ঝামেলা কম হয়।

যাক, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। নো চিন্তা ডু ফুর্তি। পরের বারে এসে ভাইরাস আর হার্ড ডিস্ক-সি.পি.ইউ-য়ের ফাংশন বুঝিয়ে দেব। এবার আমাকে যেতে হবে।

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম– না, আপনার আজকে যাওয়া হবে না। আমরা আপনার সঙ্গে সারাদিন ঘুরব। আমাদের নিকোপার্ক বা মিলেনিয়াম পার্কে নিয়ে যেতে হবে। আমরা আজ অবধি কোনটাতেই যাইনি।

– আজ হবে না রে। অন্য একদিন নিশ্চয় যাব। তোরা ছাড়া আমার আর কে আছে বল। তোরাই আমার একান্ত আপনার জন। লাঞ্চের পরে আমাদের একটা জরুরী মিটিং আছে। বড় জোর আর ঘন্টাখানেক বসতে পারি।

মা বলল– তা কী করে হয়। দুপুরে না খেয়ে কেউ যায়। গৃহস্থের অকল্যাণ হবে। আপনার জন্য আপনার দাদা সাত সকালে বাজার করে এনেছেন। আমি সকাল থেকে রান্না করছি। খেয়ে যেতেই হবে।

পিলপিলেদার সেই একই উত্তর। মুচকি হেসে 'দেখি' বলা। কথা বলতে বলতে আমরা সবাই উঠোনে মেন গেটের কাছে চলে এসেছি। আমাদের গেটটা খুব বড়। গেটের গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সামনের রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। পিলপিলেদার গাড়িটা রাস্তার একপাশে পার্ক করা আছে। উর্দিপরা ড্রাইভার একটা পালকের ডাস্টার নিয়ে গাড়িটার ওপরে বুলিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটার থেকে কিছুটা দূরে একটা লাল রঙের চকচকে মোটরবাইক দাঁড় করানো। দু'জন বেশ লম্বা স্মার্ট ছেলে বাইকটার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে আমাদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

দাদা বলল– পল্টু, দেখেছিস, লোক দুটো কেমন সন্দেহজনকভাবে আমাদের বাড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এ পাড়ায় কোনওদিন দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। বাবাকে বা পিলপিলেদাকে বলব?

কুট্টি আমাদের কথা থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফিসফিস করে বলল– আমিও দেখেছি। পিলপিলেদা আসার পর থেকেই ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় পিলপিলেদাকে ফলো করছে। সন্ত্রাসবাদীর চর নয় তো। পিলপিলেদাকে বলা দরকার। বলছিস না কেন?

পিলপিলেদাকে বলতেই এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে 'যাঃ' বললেন, মনে হল কোটের ওপরে একটা পাখির পালক লেগে আছে, সেটাকে টোকা মেরে উড়িয়ে দিলেন। আমরা চুপ করে গেলাম. পিলপিলেদা উঠোনে চেয়ারে বসতে বসতে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে টাইমটা দেখে আবার পরে নিলেন।

ছোটকা অনেকক্ষণ চুপচাপ আছে। বোধহয় বাবার ধমকের অ্যাক্শনটা এখনও রয়ে গেছে। বাবা যেই ভিতরে গেছে ছোটকা আস্তে আস্তে পিলপিলেদাকে জিগ্যেস করল– আপনার ভাল নাম নেই। কাগজেও তো পিলপিলে মুখার্জী লিখেছে। পিলপিলে তো ডাকনাম। ভাল নাম হয় নাকি!

পিলপিলেদা হাসতে হাসতে বললেন– আমার ভাল নাম ডাকনাম দুটোই পিলপিলে। কেন, পছন্দ নয়?

– না, এরকম নাম তো কখনও শুনিনি। পিলপিলে শুনলেই ডাকনাম মনে হয়। ভাল নাম বলে মেনে নেওয়া যায় না।

– কত চাও, শুনবে? ক্রিকেটার সুঁটে ব্যানার্জী, মন্টু ব্যানার্জী, ফুটবলার বাঘা সোম, মানা গুঁই, অভিনেতা কেষ্ট মুখার্জী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ক পিন্টু ভট্টাচার্য, 'চৌরঙ্গী'র স্যাটা বোস, ছাতুবাবু, লাটুবাবু– কত শুনবে? আসল কথা নামে কিছু এসে যায় না। গোলাপকে যে নামে ডাকো সেটা গোলাপই হবে।

আমরা অবাক হয়ে শুনলাম। মুখ থেকে কথা সব হারিয়ে গেল। খুব সহজ কথাই বললেন পিলপিলেদা, কিন্তু আমাদের চিন্তার স্তর সেখানে পৌঁছতে পারেনি।

হঠাৎ গেটের শব্দ হতেই তাকিয়ে দেখলাম পুরনো খবরের কাগজ কেনার জন্য একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে চেক লুঙ্গি আর জরাজীর্ণ একটা শার্ট। গালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। পিঠে নীল রঙের মস্ত কাপড়ের ঝোলা। মা দেখতে পেয়েই বলল– পল্টু, ওকে দাঁড় করা। তিন-চার মাস কাগজ বিক্রী করা হয়নি। আর রাখার জায়গা নেই।

লোকটা উবু হয়ে মাটিতে বসে কাগজ ওজন করে পাশে রাখছিল। ছুট্টি এসে বলল– দাদা, মোটর বাইকের লোকদুটো কখন চলে গেল রে?

কথার মাঝখানে আমরাও কেউ খেয়াল করিনি। পিলপিলেদার ড্রাইভার গাড়ির ভেতরে ওর সিটে বসে কিছু একটা পড়ছে। কাগজ ওজন করা হয়ে গেলে লোকটা বাবার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল– বাবু, পুরনো লোহা-লক্কড়, শিশিবোতল নেই? পুরনো ঘড়ি, ক্যামেরা, পেন থাকলে দেখাতে পারেন। ভাল জিনিস হলে ভাল দাম পাবেন।

বাবা জিগ্যেস করল– পুরনো ঘড়ি ক্যামেরা নিয়ে তোমরা কী কর?

– তা তো জানি না বাবু। আমরা অত শত খবর রাখি না। আমাদের মহাজন আছে। আমরা সব মাল সেখানে জমা দিয়ে দিই। তার বদলে পয়সা পাই। মহাজন যেদিন খুশি হয়ে যান, একটু বেশি টাকা বখশিস দিয়ে দেন।

– তুমি থাকো কোথায়? তোমাদের মহাজন কোথায় থাকে?

– আমি আমতলায় থাকি। আমরা সব মাল একটা আড়তে দিয়ে চলে যাই। পরে পয়সা নিয়ে আসি একজন দালালের কাছ থেকে। মহাজনকে আমরা কেউ দেখিনি। চিনিও না।

বাবা বলল– কী রকম ক্যামেরা তোমরা কেনো? বাচ্চাদের খেলনা ক্যামেরা।

– সব রকম। মানে ধরুন এই রকম হলেও হবে। লোকটা ওর বড় ব্যাগের ভেতর হাত গলিয়ে একটা ছোট রেক্সিনের ব্যাগ বার করল। তার ভেতর থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বার করে চোখের সামনে লাগিয়ে দু বার শাটার টিপে বলল-
- এই রকম হলেও চলবে।

পিলপিলেদা বলল– দেখি, তোমার ক্যামেরাটা। আমার একটা পুরনো ক্যামেরা আছে। দেখাচ্ছি। দেখে বল কত দেবে।

লোকটা ক্যামেরাটা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল– এটা একটা ফালতু ক্যামেরা। সকালেই একটা বাড়ির থেকে নিয়েছি। ওরা ভাঙাচোরা জিনিসের সঙ্গে ফেলে রেখেছিল। মাত্র কুড়ি টাকা দিয়েছি।

পিলপিলেদার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। কপালে দুটো ভাঁজ পড়ল। একটু রাগত স্বরে বললেন– অত ইতিহাস শুনতে চাই না। একটু দেখতে চাইছি। দেখি কেমন ক্যামেরা।

লোকটা ততক্ষণে ক্যামেরাটা ছোট ব্যাগে ভরে বড় ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়েছে। বাবার দিকে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল– দশ কেজি কাগজ হয়েছে। ক্যামেরা, ঘড়ি, পেন আর একদিন এসে নেব। আপনাদের তাড়া আছে।

লোকটা ঝোলা পিঠে ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। পিলপিলেদা রিস্টওয়াচটা খুলে একটু নাড়াচাড়া করে হাতে পরতে পরতে বললেন– দাঁড়াও। ব্যাগটা রাখো। ক্যামেরাটা দেখাও। না হলে এখান থেকে যেতে পারবে না। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনছি। কী করা উচিত, কিছু বলা উচিত কিনা বুঝে ওঠার আগেই মোটর বাইকের আওয়াজ কানে এল। কাগজওলা দ্রুত পেছনে ফিরে গেটে হাত দেওয়ার আগেই গেটের সামনে সেই লোক দুটো, যাদের আমরা বাইকের সামনে দেখেছিলাম একটু আগে।

পিলপিলেদা বজ্রগম্ভীর স্বরে লোকদুটোকে বললেন– ওকে ইন্টারসেপ্ট করুন। ব্যাগটা সার্চ করে দেখুন। কিছু ইনক্রিমিনেটিং জিনিস পাবেন। পল্টু, বিল্টু, আমার ল্যাপটপটা আনতো। মনে হচ্ছে সাসপিসাস কিছু হবে।

কাগজওলাকে প্রচন্ড নার্ভাস লাগছিল। কপাল ঘেমে টসটসে হয়ে গেছে। মোটর বাইকের লোক দুটোর একজন কাগজওলার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছে। আর একজন ব্যাগ থেকে ক্যামেরাটা বার করে পিলপিলেদার হাতে দিল। লোক দুটোর চলাফেরা, তাকানো, গলার স্বর স্বাভাবিক নয়। প্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য বড় বড় লোকদের পেছনে যে ব্ল্যাক ক্যাট দাঁড়িয়ে থাকে তাদের মত।

পিলপিলেদা আমার হাত থেকে ল্যাপটপ কম্পিউটারটা নিয়ে ক্যামেরা হাতে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। কাগজওলা হাত কচলাতে কচলাতে বলল– বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি গরিব মানুষ। আমি কিছু জানি না। আমাকে যা করতে বলেছে তাই করেছি। আমি জানিও না ক্যামেরার মধ্যে কী আছে।

মোটরবাইকের একজন বলল– কে বলেছে তোকে? কী নাম তার? কোথায় থাকে? তোর নাম কী?

– আজ্ঞে বাবু, আমার নাম ইয়াকুব। আমি কুড়ি বছর ধরে এই কাগজের ব্যবসা করছি। আমাকে 'বুলেট' নামের একজন লোক ক্যামেরাটা দিয়ে বলেছে ছবি তুলতে। আমি আর কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দেন।

পিলপিলেদা ক্যামেরাটা হাতে করে ফিরে এলেন। বললেন-
– যা ভেবেছি তাই। এটা একটা সফিসটিকেটেড ডিজিটাল ক্যামেরা। এটার মেমারি কার্ড স্ক্যান করে দেখলাম কলকাতার অনেক ইম্পর্টান্ট আর স্ট্যাটেজিক জায়গার ছবি আছে।

মোটরবাইকের লোকদুটোকে বললেন– মিস্টার দাস, মিস্টার মন্ডল আপনারা ওর জবানবন্দি নোট করুন। এক্ষুণি পুলিস এসে যাবে। হ্যান্ড ওভার করে দিন। যাদের কাজ তারা করুক। ব্যাগটা সার্চ করুন ভাল করে। আর্মস বা এক্সপ্লোসিভ থাকলে ডিফিউজ করুন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্ব পুলিশের টিম এসে গেল। পিলপিলেদাকে ধন্যবাদ দিয়ে করণীয় কাজ সেরে কাগজওলাকে হাতকড়া পরিয়ে চলে গেল। মোটর বাইকের লোকদুটো পিলপিলেদাকে স্যালুট করে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। মোটরবাইকের শব্দ আর ধোঁয়ায় জায়গাটা অনেকক্ষণ ভারী হয়ে থাকল। পিলপিলেদা আরাম করে পা ছড়িয়ে বললেন-
– বৌদি, কফি।

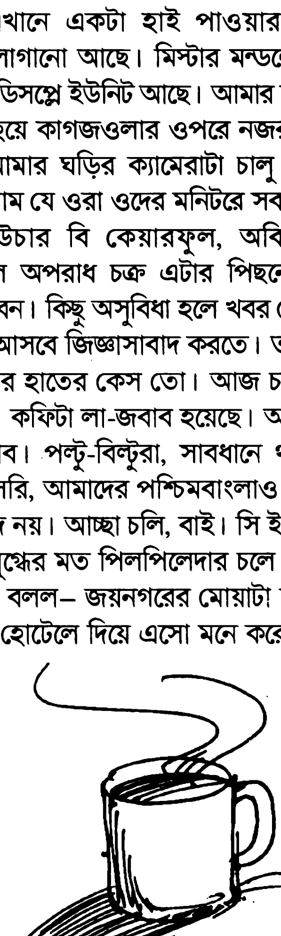
বাবা বলল– কী সাংঘাতিক কান্ড বলুন তো। কাকে বিশ্বাস করব। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন। না হলে কী যে হত। আপনার কী করে সন্দেহ হল? আপনি তো ভগবান।

– ক্যামেরাটা বের করতেই বুঝে ছিলাম ওটা ডিজিটাল ক্যামেরা। তার আগে ও যখন ঢোকে তখনই মিস্টার দাস আর মন্ডলকে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

কী করে দিলেন? আপনি তো বাইরে যাননি।

পিলপিলেদা রিস্টওয়াচটা হাত থেকে খুলে আমাদের সামনে রেখে বললেন– এই দেখ, এটা সাধারণ রিস্টওয়াচ নয়। ভাল করে দেখ, এখানে একটা হাই পাওয়ার ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন লাগানো আছে। মিস্টার মন্ডলের কাছে একটা রিসিভার আর ডিসপ্লে ইউনিট আছে। আমার সিগন্যাল পেতেই ওরা অ্যালার্ট হয়ে কাগজওলার ওপরে নজর রাখছিল। ইন-ফ্যাক্ট আমি আমার ঘড়ির ক্যামেরাটা চালু করে এমনভাবে প্রজেক্ট করছিলাম যে ওরা ওদের মনিটরে সব ওয়াচ করছিল। তবে ইন ফিউচার বি কেয়ারফুল, অবিনাশদা। একটা ইনটারন্যাশনাল অপরাধ চক্র এটার পিছনে কাজ করছে। সাবধানে থাকবেন। কিছু অসুবিধা হলে খবর দেবেন। পুলিশের লোক হয়তো আসবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তবে বেশি সমস্যা হবে না। আমার হাতের কেস তো। আজ চলি, অবিনাশদা। বৌদি, আসছি। কফিটা লা-জবাব হয়েছে। আর একদিন এসে লাঞ্চ খেয়ে যাব। পল্টু-বিল্টুরা, সাবধানে থাকিস। তোদের পশ্চিম বাং..., সরি, আমাদের পশ্চিমবাংলাও কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নয়। আচ্ছা চলি, বাই। সি ইউ অল এগেন।...

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত পিলপিলেদার চলে যাওয়া দেখলাম. মা দৌড়ে এসে বলল– জয়নগরের মোয়াটা নিয়ে যেতে ভুলে গেলেন। কাল হোটেলে দিয়ে এসো মনে করে।



শৈলেনকুমার দত্ত

কষ্ট না করলে



কেষ্টদার অনেক মাসিপিসির গল্প শুনেছি, আমরা সবাই সেসব জায়গায় বেড়াতে যেতেও চেয়েছি। কিন্তু কেষ্টদা কোনোওদিন কোথাও নিয়ে যায়নি। নানান অজুহাতে ঠিক পাশ কাটিয়ে গেছে! সেবার শিলিগুড়ি থেকে কেষ্টদার এক পিসি এসেছিলেন, আমরা কেষ্টদার বদলে পিসির কাছেই আবদার করলাম– সেখানে বেড়াতে যাব বলে।

তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আর আমরাও কেষ্টদাকে চেপে ধরলাম– যাওয়ার দিন ঠিক করার জন্যে। এবারে আর কেষ্টদা এড়াতে পারল না। কামরূপ এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে আমরা শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেলাম– আমি, শংকর, রাজীব, দেবু আর দলপতি কেষ্টদা তো আছেই।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এতদূর বেড়াতে যাবার সুযোগ আগে কখনও হয়নি। রওনা হবার দিন থেকে সকলের মন এত প্রফুল্ল ছিল যে, সব কিছুই বেশ ভালো লাগছিল। কোনো অসুবিধেকেই অসুবিধে বলে মনে হয়নি। রাতে কেষ্টদা ছাড়া আমরা কেউ ট্রেনে ঘুমোবারও চেষ্টা করিনি। আনন্দ করতে-করতে রাত জেগেছি!

ভোরবেলা নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে মনে হল– যেন এক স্বপ্নের জগতে চলে এসেছি! দূর থেকে বৃষ্টিস্নাত হিমালয় পর্বতমালার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি, অরণ্যের বিশাল বিশাল বৃক্ষের ঝাঁকড়া মাথা দোলানো দেখে মনে হচ্ছিল– এতদিন বুঝি অনেক কিছুই দেখা হয়নি।

এক কাপ চা খেয়ে কেষ্টদা গাড়ির সন্ধানে গেল। এখান থেকে পিসির বাড়ি যেতে এক ঘন্টাও লাগবে না। আমরা মালপত্রগুলো এক জায়গায় সাজিয়ে রাখতে রাখতে কেষ্টদা এসে হাজির। আমাদের নিয়ে যেতে পিসির বাড়ি থেকেই গাড়ি এসেছে।

কেষ্টদা যত গুলই মারুক না কেন, তার কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজন যে জমকালো আছে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজীব কেষ্টদার গুণগান করতে করতে মালপত্রগুলো গাড়িতে তুলতে গেল। কিন্তু ড্রাইভার মুকুন্দদা একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। সে কি কথা। তোমরা মাল তুলতে যাবে কী দুঃখে।

গাড়িতে যেতে যেতে মুকুন্দদার সঙ্গে অনেক কথা হল। জানা গেল এখানে কত কী দেখার আছে। দার্জিলিং-কালিম্পং-সিকিম-মংপু এসব তো আছেই, আর আছে অরণ্য। শংকর উদাসীনভাবে বলতে যাচ্ছিল– অরণ্যে আর নতুন কী দেখার আছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে কেষ্টদা জিজ্ঞেস করল– কেন, জঙ্গলে তোর বাঘ দেখতে ইচ্ছে করে না?

রাজীব ভীষণ আগ্রহ দেখিয়ে বলল– দেখাবে কেষ্টদা? আমার ভীষণ ইচ্ছে করে।

কেষ্টদা মুচকি হেসে মুকুন্দদাকে জিজ্ঞেস করল– হ্যাগো, ঝন্টুদা এখনও শিকারে যান?

মুকুন্দদা ঘাড় কাত করে বললেন– যায় না আবার। সারাজীবন তো এই একটাই কাজ। শুধু জঙ্গল, জঙ্গল আর জঙ্গল। তা ওর ঘরে কোনোওদিন গেছো?

– হ্যাঁ, যাইনি আবার। সে-গল্পতো এদের কাছেও করেছি-- বলে কেষ্টদা আমাদের দিকে তাকাল।

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জানালাম– না, আমরা কেউ ঝন্টুদার নামও শুনিনি।

কেষ্টদা তবু অনড়। সে নাকি বলেছেই। যা হোক, আমাদের অনুরোধে আর একবার বলতে হল। এমন মানুষের কথা একবার-দুবার নয়, একশ'বার শুনলেও পুরোনো হয় না। ভদ্রলোক সংসার করেননি, শুধু শিকারের নেশা। তাঁর ঘরে বাঘের ছাল থেকে শুরু করে অজস্র জিনিস আছে। তবে সবচেয়ে অবাক করা জিনিস হল দরজার ওপরে এক বিরাট অজগর সাপের চামড়া। টিনের আটচালার কাঠ থেকে পেঁচিয়ে নেমে এসেছে দরজার কাছ পর্যন্ত। আচমকা দেখলে যে কোনো লোক ঘাবড়ে যাবে। মনে হবে সত্যিকারের সাপ। আসলে সাপটার ভেতরের অংশগুলো ফেলে দিয়ে তুলো ভরাট করে আবার সেলাই করা হয়েছে।

এই ঝন্টুদাই সকলকে শিকারে নিয়ে যান। জঙ্গল এবং জীবজন্তু সম্পর্কে ভীষণ অভিজ্ঞ। কেষ্টদা মুকুন্দদাকে বলল– হ্যাগো, বললে ঝন্টুদা আমাদের একদিন জঙ্গলে নিয়ে যাবে না?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নিয়ে যাবে না। হরদমই তো যাচ্ছে।

আমরা একথা শুনে এত আনন্দিত হলাম যে, বলার কথা নয়। আবার কেষ্টদার পিসির বাড়িতে পৌঁছে যখন দেখি সেই ঝন্টুদাই বসে গল্প করছেন, তখন তো আমরা আহ্লাদে আটখানা।

আমাদের আগ্রহের কথা শুনে ঝন্টুদা নিজেও খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন– তোমরা তো কদিন আছো, আমি ব্যবস্থা করে তোমাদের দিনক্ষণ জানিয়ে যাব।

পিসিমার আদর যত্নে আমরা এমনিতেই খুব অবাক হচ্ছিলাম, আরও অবাক হলাম সেদিন বিকেলে। ঝন্টুদা এসে বললেন-- কাল সন্ধেবেলাতেই আমরা জঙ্গলে যাব। দুজন শিকারী আমাকে খুব ধরেছে, ওদের সঙ্গে তোমরাও যাবে।

শুনে যে আমাদের কী আনন্দ হল, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

•

পরের দিন সন্ধ্যায় যে কত অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল, ভাবতেও অবাক লাগে। একটা বড় জিপে আমরা

রওনা হলাম। আমরা পাঁচজন আনাড়ী বলে সীটে বসে থাকব, আর হুড খুলে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবেন দুজন শিকারী আর ঝন্টুদা। ঝন্টুদা হলেন স্পটার, তাঁর হাতে থাকবে বিরাট এক শক্তিশালী টর্চ। তিনি যেখানে আলো ফেলবেন, প্রয়োজন হলে শিকারীরা সেখানেই গুলি করবেন।

গাড়িতে বসে আমাদের গায়ে যেন রোমাঞ্চের কাঁটা দিতে লাগল। তবে যাত্রা শুরুর আগে ঝন্টুদা অনেকগুলো কথা কবুল করিয়ে নিলেন। সমস্ত শিকারী বিশ্বাস করে যে, আনাড়ী সঙ্গে থাকলে যাত্রা খুব পয়মন্ত হয়। তবে আনাড়ীদের সতর্কতার জন্য যা-যা জানা প্রয়োজন, সেগুলো হল– ঝন্টুদা না-বললে কেউ কোনো অবস্থাতেই গাড়ি থেকে নামতে পারবে না। কোনো রকম আওয়াজ করা বা আলো জ্বালা নিষিদ্ধ। অহেতুক কৌতূহলও দেখানো চলবে না। আর ঝন্টুদা আকারে-ইঙ্গিতে যখন যা নির্দেশ দেবেন, সকলকে সেটা মানতে হবে।

নির্দেশ শিরোধার্য করে সকলে গাড়িতে বসল। গাড়ি ছুটে চলল জঙ্গলের দিকে। ঘড়িতে তখন রাত আটটা। জঙ্গলের কাছাকাছি এসে ঝন্টুদা বনদপ্তরের লোকেদের সঙ্গে কীসব কথা বললেন, সেসব নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাইনি। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি এবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু একটা জিপ চলার রাস্তা, তার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলল। যতটা নিঃশব্দে যাওয়া যায়, আর সামনে শুধু ফগ-লাইটের মৃদু আলো। অন্ধকার গাড়িতে আমরা এতগুলো লোক বসে আছি রুদ্ধ বিস্ময়ে।

ঝন্টুদা বলেছিলেন তিনি যেখানে টর্চের আলো ফেলবেন, সেদিকে তাকাতে। আলো যেখানেই পড়ে, আমরা সেদিকে তাকাই। একবার একটা বুনো খরগোশ দেখতে পেলাম, একবার দেখলাম একটা শঙ্খিনী সাপ। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু বাঘ-হরিণ– এসব কোথায়?

গহন অরণ্যের মধ্যে বেশ কিছুটা ঢুকে পড়তে একটা ফাঁকা জমি পাওয়া গেল। ঝন্টুদা গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিলেন। এখানে রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হবে। গাড়িতে বসে বসে সকলে রুটি-মাংস খেলাম। ঘড়িতে তখন রাত দশটা। সব কিছুতেই তখন যেন রোমাঞ্চের ছোঁয়া।

ঝন্টুদার শর্ত অনুযায়ী এতক্ষণ কেউ একটা টুঁ শব্দ করেনি। এবার ঝন্টুদা নিজেই কথা বললেন। ঘ্রাণ নিতে নিতে খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেসা করলেন - গন্ধ পাচ্ছিস? প্রশ্নটা শিকারি দুজনকে হলেও, আমরা ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলাম।হ্যাঁ, তাইতো ! চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচার কাছে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি!

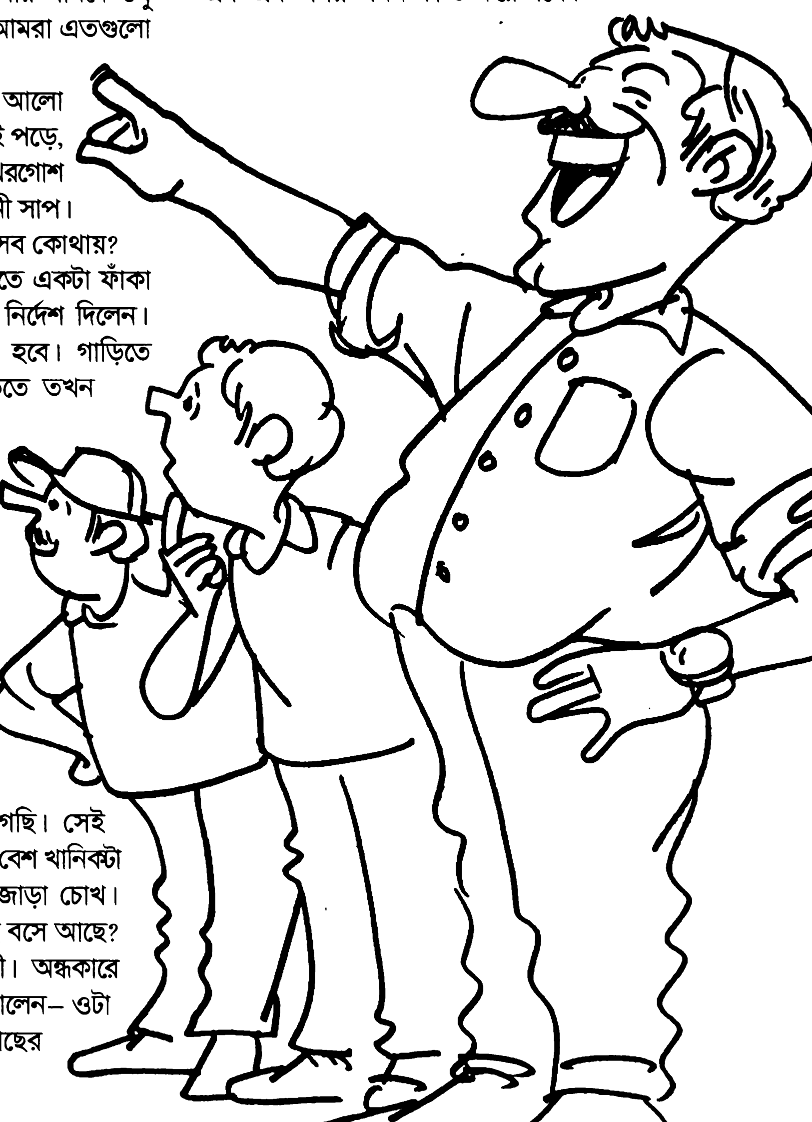
আমাদের তো দম বন্ধ হবার উপক্রম। আমরা একেবারে বাঘের কাছাকাছি এসে গেছি। সেই উত্তেজনার মধ্যে ঝন্টুদা টর্চের আলো ফেললেন, বেশ খানিকটা উঁচুতে। সেখানে চকচক করে উঠল এক জোড়া চোখ। কিন্তু এত উঁচুতে কেন। বাঘ কি তাহলে গাছে বসে আছে?

আলো সরাতেই ছুটে পালাল একটা প্রাণী। অন্ধকারে আমরা বাঘই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঝন্টুদা জানালেন– ওটা সম্বর। আর হরিণ যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের পাতা চিবচ্ছে, তখন এ তল্লাটে কোথাও বাঘ নেই।

বলতে বলতেই শিকারী দুজন এবং ঝন্টুদা জিপ থেকে নেমে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী আমাদের কারোর গাড়ি থেকে নামার কথা নয়। কিন্তু কেষ্টদা নেমে গেল। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বলে আমরা ভেবেছিলাম, কেষ্টদা বোধহয় কোনো প্রয়োজনে নেমেছে। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে না দেখা যাচ্ছে তিনজন শিকারীকে, না দেখা যাচ্ছে কেষ্টদাকে। গাড়িতে শুধু ড্রাইভার বীর বাহাদুরের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। এই অবস্থার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কাটল।

হঠাৎ ঝন্টুদা সহ দুজন শিকারী ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন এবং নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। কেষ্টদা যে গাড়িতে নেই, অন্ধকারে সেটা তিনজনের কেউ খেয়াল করেনি। খানিকটা যেতে রাজীব ইশারা করে দেখাল– কেষ্টদা ওঠেনি।

সে কি! ঝন্টুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তারপর অন্ধকারে সব কটা মুখ দেখে নিয়ে গাড়ি ঘোরাতে বললেন। কিন্তু এত গহন জঙ্গলে গাড়ি ঘোরানো কি সোজা কথা। আরও কিছুটা গিয়ে তবে একটু সুবিধামতন জায়গা মিলল। তাও কি সহজে ঘোরে। সামনে-পিছনে করে করে গাড়ি শেষ পর্যন্ত ঘুরল। তবে সব মিলে প্রায় দশ মিনিট সময় লেগে গেল। অন্ধকার জঙ্গলে বিপদের পক্ষে এটা পর্যাপ্ত সময়। কেষ্টদাও তেমনি– এক এক সময় এমন কান্ড করে বসে।



গাড়িটা একটু এগোতেই অন্ধকারের মধ্যে সাদা রঙের কী একটা দেখা গেল। আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে, কেষ্টদাই এগিয়ে আসছে। জঙ্গলে চেঁচামেচি করা যে বিপজ্জনক, সেটা তো তার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু না, কাছে গিয়ে দেখা গেল– সেটা একটা হরিণছানা। সে আমাদের পথ আগলে দাঁড়াল। গাড়ির ফগ-লাইট নিভিয়ে দেওয়া হল, অন্ধকারে যদি সে পথ ছেড়ে দেয়। কিন্তু না, তাতেও সে গেল না।

অগত্যা বীর বাহাদুরকে গাড়ি থেকে নামতে হল। সে তাকে কোলে করে তুলে পাশে রেখে দিয়ে আবার গাড়িতে বসল। কিন্তু যেই স্টার্ট দিয়েছে, আবার সে ছিটকে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। বীর বাহাদুরকে হাত দেখিয়ে ঝন্টুদা নামলেন। তিনি হরিণ ছানাটাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি এগিয়ে গেল।

যে জায়গা থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম, সেখানে এসে দেখা গেল ফাঁকা। কেষ্টদা নেই। ঝন্টুদা সংশয় প্রকাশ করলেন। কারণ তরাই-এর এ অঞ্চলটায় খুব বেশি না হলেও, ব্ল্যাক প্যান্থার জাতের এক ধরণের চিতা আছে। তারা যেমন ধূর্ত, তেমনি ভয়ঙ্কর। আমরা মনে মনে প্রমাদ গুণতে লাগলাম।

গাড়ি থেকে ওরা তিন জনেই নামলেন। ঝন্টুদা শক্তিশালী টর্চের আলো ফেললেন চারদিকে। কত কী যে ছোটখাট জন্তু-জানোয়ারের দেখা মিলল, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কেষ্টদার পাত্তা পাওয়া গেল না।

হঠাৎ টর্চের আলোতে এক জোড়া চটি নজরে পড়ল। ঝন্টুদার ইশারায় আমরা সেটা সনাক্ত করলাম– হ্যাঁ, ওটা কেষ্টদারই চটি।

আমরা ভয়ে তখন সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। কেষ্টদার পিসির কাছেই বা মুখ দেখাব কী করে, কী করেই বা বাড়ি ফিরব। ঝন্টুদা কিন্তু খুব শক্ত ধাঁচের মানুষ। তিনি এই আশঙ্কাকে একেবারেই আমল দিলেন না। তিনি তখন ছোটখাট গাছপালাগুলো দেখছে, সেখানে কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন আছে কিনা। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে তুলে নিয়ে যাবে আর সে কোনো প্রতিরোধ করবে না, তাতো আর হয় না।

যাহোক ওরা তিনজনে এবারে এক জায়গায় বসলেন। আমরাও গাড়িতে বসে আছি। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। এক একটা মিনিট যেন এক একটা ঘন্টা মনে হচ্ছে। শিকার তখন মাথায় উঠে গেছে। ঝন্টুদার অনুমতি নিয়ে আমরাও এবার গাড়ি থেকে নেমে এলাম। বড় বড় ঘাসের কার্পেট পাতা মাঠটায় সবাই গোল হয়ে বসা হল। কেষ্টদা যেখানেই যাক, এখানে তো ফিরবেই।

বসে বসে মৃদুস্বরে কথা বলারও অনুমতি মিলল। কিন্তু কী কথা বলব। তখন শুধু কেষ্টদার চিন্তা। যদি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গিয়ে থাকে– তাহলে তো আমাদের মুখ দেখানোই ভার হয়ে উঠবে।

দেখতে দেখতে দু ঘন্টা কেটে গেল। জঙ্গলে যে এত তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফোটে, জানতাম না। রাত তিনটেতেই গাছগুলোর উচ্চতা দেখা যায়। এবার বুঝতে পারলাম, আমরা কী গভীর জঙ্গলে ঢুকে এসেছি। ফ্লাস্ক থেকে চা বের করে সকলে খাওয়া হল বটে, কিন্তু তেমন জমল না। কী করে জমবে। মনের মধ্যে সেই খিচখিচ ভাবটা তো রয়েছে।

শিকারী দুজন ঝন্টুদার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। আমরা চার জন শুধু মশা মারছি। কী বড় মশা, আমাদের চারজনকেই যেন বেশি কামড়াচ্ছে। হাত-পা সব ফুলে উঠেছে। এর মধ্যে শংকর উ-হু-হু করে লাফিয়ে উঠল। ঘাস বনে ওকে কী যেন কামড়ে দিয়েছে। সাপটাপ নয়তো!

ঝন্টুদা ঘাসের তলা থেকে একটা কালো জোঁক বের করে দেখালেন। ওটাই কামড়েছে। তবু ভালো, জঙ্গলে যেন সবেতেই মনে হয়– হয় বাঘ, না হয় সাপ।

অসহ্য উৎকণ্ঠায় আমরা মুহূর্ত গুনছি। কখন সকাল হয়। কিন্তু লোকজন বেরোনোর আগে আমাদের জঙ্গলের বাইরে চলে যেতে হবে। বনদপ্তরের কড়ার এটাই। ঝন্টুদা ঘড়ি দেখে ঠিক করলেন, আরও এক ঘন্টার মত সময় আমরা এখানে থাকতে পারব।

সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে নানান আওয়াজ আরম্ভ হল। এতক্ষণ নিঝুম-নিস্তব্ধ অরণ্যে কত প্রাণী যে ঘুমন্ত ছিল, বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের মাথায় তখন সেই এক চিন্তা। কেষ্টদাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কারও স্বস্তি নেই। ঝন্টুদা এই জায়গা থেকে একটুও সরতে চাইলেন না। জঙ্গলে যে কেষ্টদা একলা বেশিদূর এগোতে পারবে না, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। অন্য কোনো সম্ভাবনা থাকলেও, এই জায়গা থেকেই তার সূত্র পাওয়া যাবে। শুধু দিনের আলোটা একটু পরিস্কার হোক।

এইভাবে অসহ্য মানসিক চাপের মধ্যে আরও একটা ঘন্টা কাটল।

এখন কিন্তু অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। ঝন্টুদা এবার টর্চ রেখে কিছুটা এগিয়ে গেলেন। আমরা শিকারী দুজন বিমানদা ও দিলীপদার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।ওঁদের সঙ্গে তো কথাই বলা হয়নি।

ঝন্টুদা একটু পরেই আমাদের ডাকলেন। আমরা সকলে পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গেলাম। বেশ কিছুটা গিয়ে ঝন্টুদার সঙ্গে দেখা হল। হাসতে হাসতে তিনি সামনের একটা গাছের দিকে আঙুল দেখালেন। অবাক কান্ড। তাকিয়ে দেখি, সেই গাছের ডালে কেষ্টদা বসে আছে। ভয়ে মুখচোখ কেমন যেন বিবর্ণ।

আমাদের দেখে কেষ্টদা কোনোরকমে গাছ থেকে নেমে এল। ঝন্টুদা প্রশ্ন করার আগেই তার এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কারণ জানাল। আমাদের গাড়ি চলে যাবার পর কেষ্টদা এখানে দাঁড়িয়েই ছিল, হঠাৎ খেয়াল করে সামনের জঙ্গলে কী একটা নড়ছে। কেষ্টদা তাই এখান থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ওই গাছটায় উঠে পড়ে। তার মাথায় ছিল ঝন্টুদার আশ্বাস– কাছাকাছি কোনো বাঘ নেই, আর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, আমরা এখানেই আসব।

ঝন্টুদা আর প্রশ্ন না করে হো হো করে হেসে উঠলেন। আমরাও খুব আনন্দ পেলাম। কেষ্টদাকে যে অক্ষত ফিরে পাব, এটা কি আমরা ভেবেছিলাম।

রাজীব দুহাতে মশার কামড়ের দাগগুলো হাত বুলোতে বুলোতে বলল– তোমার জন্যে আমরা কী কষ্টটাই না করলাম এতক্ষণ।

ঝন্টুদা আবার হাসলেন– তাই তো কেষ্ট মিলল। কষ্ট না করলে কি কেষ্ট মেলে।

•

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

চড়াই যদি হরতাল করে



আজ রবিবার। পিংকি ওর মা-বাবার সঙ্গে পিকনিকে গেছে। পম বসে বসে টিভি দেখছিল। পিংকিদের পোষা বেড়ালটার নাম— পম। টিভিতে তখন ন্যাশানাল জিওগ্রাফি চলছে। হঠাৎ এবার ঘরে ঢুকে পড়ল একটা চড়াই আর একটা কাক। ওই পাড়াতেই থাকে। পম ওদের খুবই চেনে। চড়াইটার নাম— টিং। আর কাকটার নাম— ভোঁদা। টিং বলল— 'পমদা ভাল আছো?' ভোঁদা বলল— 'আসতে পারি?' পম বলল, 'চুপ করে বোস। গোলমাল করিসনি। দ্যাখ টিভিতে কী দ্যাখাচ্ছে।' টিং দেখল একটা বাঘ তখন একটা হরিণকে তাড়া করছে। ধরলেই ঘাড় মটকাবে।

টিং ভীষণ চঞ্চল। তিড়িং বিড়িং করে এদিক ওদিক লাফাতে লাফাতে বলল— 'আমি এই সোফাটার ওপরে বসতে পারি?' ভোঁদা একটা সেন্টার টেবিলের ওপরে বসেছিল। বলল, 'আমি কী এখানটা বসতে পারি?' পম বলল, 'বসবে বোসো, কিন্তু যেন নোংরা কোরো না। পিংকির মাকে তো চেনো না। ভীষণ রাগী। বাড়ি ফিরে যদি দ্যাখে, ঘর দোরে তোমাদের নোংরা পড়ে, আমাকে আজ আর তাহলে খেতে দেবে না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'বাঘটার কাণ্ড দেখছিস। হরিণটাকে কীভাবে ছুটিয়ে মারছে দ্যাখ।'

ভোঁদা বলল— 'বাঘগুলো তো ওই রকমই। ভীষণ নোলা ওদের। গায়ে জোর আছে বলে নিজেদের যেন কী ভাবে। যাকে যখন ইচ্ছে ধরে ধরে খায়।' পম বলল, 'তোরা চুপ কর।' ভোঁদা বলল— 'তুমি তো বাঘের মাসি। ওদের তুমি বকতে পারো না।' পম বলল, 'আবার বলছি তোরা একটু চুপ কর। টিভিটা দেখতে দে মন দিয়ে। রোজ তো টিভি দেখার সুযোগ পাই না। পিংকির বাবাটা ভীষণ মেজাজী। আমি টিভির সামনে বসলেই ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে। তাছাড়া সিগারেট খায় বলে আমি ওর কাছে থাকতেও চাই না। বিচ্ছিরি গন্ধ। আমার একদম ভাল লাগে না।'

ওরা এবার তিনজনে চুপচাপ বসে টিভি দেখতে লাগল। বাঘটা তখন হরিণটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর তাই দেখে টিং রেগেমেগে টিভিটার মাথায় চড়ে বসল। বলল, 'ইচ্ছে করছে বাঘটাকে দিই ঠুকরে।' পম বলল, 'অত বাহাদুরীতে কাজ নেই। যেখানে বসে ছিলে ওখানে গিয়েই বসে পড়ো। ঘর ময় উড়ে বেড়িও না।' ভোঁদা বলল, 'পমদা, ঘরে কোন খাবার নেই? ভীষণ খিদে পাচ্ছে।' পম বলল, 'তোমাকে দেবার মতন তেমন কিছু নেই ঘরে। টিং চাইলে ওকে মুড়ি দিতে পারি।'

– 'সত্যি?' কথাটা শুনে টিং লেজ নাচাল।

পম বলল, 'হ্যাঁ, মুড়ি আর বাদাম ভাজা।'

– 'কোই দাও।' টিং আনন্দে নেচে উঠল।

পম বলল, 'পিংকির ঘরে যা। দেখবি মেঝেতে অনেক মুড়ি আর বাদাম ছড়ানো আছে। যত পারিস খা।'

– 'সেকী? কে ছড়াল বাদাম মুড়ি?' ভোঁদা অবাক হয়ে বলল, 'আমিও তো বাদাম মুড়ি খেতে ভালবাসি।'

– 'ছড়াবে আবার কে। ওই পিংকিটা। ওরতো খাওয়ার ছিরিই অমন। কত বকুনি খায়। তবু শেখে না। ওকে কিছু খেতে দিলেই দেখবি অমন ছড়িয়েমড়িয়ে খাচ্ছে।'

টিং বলল, 'মানুষের বাচ্চাগুলো সব যেন কেমন কেমন! ভাল করে খেতেও জানে না।' কথাটা বলেই টিং আর ভোঁদা গিয়ে ঢুকল পাশের ঘরে। পম বসে রইল টিভির সামনে।

টিং আর ভোঁদা ঠক ঠক করে ঠুকে ঠুকে বাদাম আর মুড়ি খেতে লাগল। পম বলল, 'যাক, তোরা বিশুর মায়ের অনেক কাজই করে দিলি। তোরা না এলে, বিশুর মাকে ওইগুলো ঝেঁটিয়ে সাফ করতে হত। ব্যাচারি কী ভীষণ বুড়ি হয়ে গেছে। অথচ পিংকির মাটা ওকে কী খাটানই না খাটায়।'

টিং বলল, 'আজকে তুমি আমাদের তাড়া করছো না? অন্যদিন হলে তো এতক্ষন খ্যাক্ খ্যাক্ করে তেড়ে আসতে।'

– 'সে তো আমায় করতেই হয়। তোদের তাড়ানোর জন্যেই তো এরা আমায় পুষেছে। রোজ এত খেতে দেয়। এরা না পুষলে আমার কী দশা হত বলতো?'

'কেন?' টিং বলল, 'এরা না পুষলে তুমি তখন বনে গিয়ে থাকতে।'

– 'ছোট প্রাণীদের বনে থাকা কী অতই সহজ।' পম বলল, 'দেখলি তো তখন হরিণটার কী দশা হল? আমাকেও তখন অমন কেউ খেয়ে নিতো।'

টিং বলল, 'তাই জন্যে কী তোমরা সব বন ছেড়ে পালিয়ে এসেছো? এসে এখন মানুষের সঙ্গে থাকো?'

পম বলল, 'বলতে পারিস।'

ভোঁদা বলল, 'আমিও তো আগে বনে থাকতাম। তারপর মানুষরা শুরু করল বন কেটে কেটে সাফ করা। বন সাফ করে বাড়ি বানানো। বানাতে বানাতে এখন চারদিকে বাড়ির জঙ্গল হয়ে গেছে। বিচ্ছিরি লাগে এমন বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে থাকতে।'

পম বলল, 'আমারও তাই।'

– 'তাহলে তুমি ফিরে যাওনা কেন•বনে?' টিং জানতে চাইল।

পম ভুরু নাচিয়ে বলল— 'এই পিংকিটার জন্যে। মেয়েটা

আমায় এমন মায়ায় বেঁধেছে যে ওকে ফেলে আমার আর কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না। কষ্ট হলেও আমি এখানেই পড়ে থাকি।'

টিং বলল, 'তোমার আবার কষ্ট কি? ঘন্টায় ঘন্টায় ভাল মন্দ খাচ্ছো আর মোটাচ্ছো। পিংকিটা তো কিছুই খায় না। ওর দুধ, আইসক্রিম, সন্দেশ সবই তো তোমার পেটে যায়।'

– 'সেটা ঠিকই। কিন্তু বদলে আমি তো এদের কাজও করে দিই অনেক।'

– 'কী করো শুনি?' ভোঁদা জানতে চাইল।

পম বলল, 'জানিস, আমি আছি বলে এদের বাড়িতে একটাও ইঁদুর নেই। একটাও আরশোলা নেই। পোকা, মাকড়, মশা সব আমি মেরে মেরে সাফ করে দিই।'

টিং বলল, 'তুমি তো আমাদেরও তাড়িয়ে মারো। এক আধ দিন তোমাদের জানলায় বসলেই তুমি বাঘের মত তেড়ে আসো।'

– 'ওটা তো লোক দ্যাখানি।' পম হেসে ফেলে বলল, এরা আমায় খেতে দেয়, আর এদের জন্যে তো কিছু কাজ আমার করাই উচিত– তাই না?

– 'তার মানে, তুমি আমাদের সত্যিকারের তাড়া করো না? তাড়া করো মিথ্যে মিথ্যে?' টিং বলল।

– 'বটেই তো। তোদের সঙ্গে আমি খারাপ ব্যবহার করবো কেন বল? তোরা তো সবাই আমার বন্ধু। আমরা এক পাড়াতে থাকি।'

– 'তাহলে তোমার এখানে থাকতে ভাল লাগে না কেন?'

– আসলে আগে পিংকিরা যেখানে থাকতো, সেখানে মাঠ ছিল, পুকুর ছিল, গাছ ছিল, আরো কত বন্ধু ছিল, কাঠবিড়ালী, টিয়া, বাঁদর, কোকিল, গরু বাছুর, ছাগল। তারপর হঠাৎ এরা একদিন চলে এল এই মাল্টিস্টোরিড'য়ে। এই বহুতল বাড়ি গুলো আমার একদম ভাল লাগে না। এখানে কোথাও একটা পাখি নেই, কোথাও তেমন বড় বাগান নেই, কোথাও একটা পুকুর নেই, খেলার মাঠ নেই। আর দরজা দিয়ে বেরুলেই অমনি দেখবি কেউ না কেউ তেড়ে আসছে। মারতে আসছে। এসব আমার অসহ্য লাগে। এক এক সময় মনে হয় পালাই কোথাও।'

ভোঁদা বলল, 'ঠিক বলেছো।' একটু থেমে বলল, 'তুমি তো জানো আমি কোথায় থাকি। ওই বারো তলা ফ্ল্যাটবাড়িটার দশ তলার বারান্দার কোণে। ওখানে কী থাকা যায়? অথচ গাছে কোথাও বাসা করলেই অমনি দারোয়ানগুলো খোঁচা মেরে ভেঙে দেবে। ওতে নাকি ওদের বাগানের শোভা নষ্ট হয়। ভাবা যায়। গাছ করবে, অথচ তাতে পাখি বসবে না!'

টিং ওর ডানাটাকে মেলে ধরে বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো আমার ডানার ঘাটা দ্যাখো।'

– 'ওমা,' পম টিভির দিক থেকে মুখ সরিয়ে টিং-এর ডানাটা দেখে বলল, 'কে করল তোর এই দশা?'

টিং বলল, 'বুম্বা। ওই দত্তবাবুর বাচ্চাটা। ওকে ওর মামা একটা গুলতি কিনে দিয়েছে। ও সেটা দিয়ে রোজ আমাদের কাউকে না কাউকে মারবেই মারবে। অথচ আমাদের কিছুই করার নেই।'

পম এবার গোঁফ নাচিয়ে বলল, 'করার নেই মানে? মানুষ ভেবেছে কী? বন কেটে কেটে পশু-পাখিদের তাড়াবে। যেখানে সেখানে বাড়ি বানাবে। আবার সেই বাড়ির কোথাও থাকতে গেলে গুলতি মারবে। তাড়া করবে। আমরা সব কোথায় যাবো শুনি? এই দুনিয়াটা যেমন মানুষের জন্যে, তেমনি আমাদের জন্যে তো বটে।'

– 'ঠিকই।' টিং বলল, 'কিন্তু আমরা কী মানুষের সঙ্গে পারবো? ওদের কত শক্তি। কত বুদ্ধি।'

– 'বাজে বকিস নি।' পম রেগে মেগে টিভিটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আমরা ইচ্ছে করলে মানুষকে অনেক ভাবেই জব্দ করতে পারি। আমরা যদি হরতাল করি তখন মানুষ বুঝবে আমাদের প্রয়োজনটা ঠিক কতটা।'

– 'আমরা কী পারবো হরতাল করতে?' ভোঁদা বলল।

– 'কেন পারবো না। সবাই মিলে দু-তিন দিন হাত গুটিয়ে বসে গেলেই হল।'

টিং বলল, 'কিন্তু আমরা কী পারবো না খেয়ে থাকতে। আমরা তো মিনিটে মিনিটে খাই।'

– 'আরে হরতাল মানে তো আর অনশন ধর্মঘট নয়। যেমন খাস খাবি। শুধু কোন কাজ করবি না। ব্যাস্। তাহলেই দেখবি মানুষদের কী হাল হয়।' পম চেঁচিয়ে উঠল।

কথাটা শুনেই ভোঁদা হুশ্ করে উড়ে গেল জানলার ফাঁক দিয়ে। তার পেছনে পেছনে ছুটল টিং। ভোঁদা সবাইকে বলতে লাগল– চিল, শকুন, কুকুর, শালিক, কাক, 'কাল থেকে হরতাল। তোমরা কেউ কোন কাজ করবে না। টানা তিন দিন। স্রেফ খাবে, দাবে আর লুকিয়ে বসে থাকবে।'

পরের দিন থেকে সত্যিই ভোঁদা, টিং আর পম হরতাল করে বসল। পম লুকিয়ে বসে রইল খাটের তলায়, বাক্সর পেছনে। টিংরা সব গেল জাম গাছের পাতার ফাঁকে লুকতে। কাকগুলো পালাল অনেক উঁচু বাড়ির মাথায়। কুকুরেরা চলে গেল অন্য পাড়ায়। শালিকরা পালাল বনে। চিলগুলো ভাসতে লাগল আকাশে। এদিকে পিংকিদের পাড়ার পথে পথে জমে উঠল যত নোংরা, আবর্জনা। পিংকিদের ঘরের মেঝেগুলো ভরে উঠল মুড়ি, মিছরি, বাদাম, চকলেটের টুকরোতে। পিংকির মায়ের বিছানায় ঘুরে বেড়াতে লাগল আরশোলা। দূরে কোথায় যেন একটা মরা কুকুর পড়ে ছিল। তার পচা গন্ধে পিংকিদের পাড়াটা ভরে গেল। একটি চিল, কী শকুন কেউ এল না সেটার সৎকার করতে। সমস্ত পল্লীটাকে এমন নোংরা হতে দেখে পিংকির বাবা বলল, 'হঠাৎ কী হল বলতো? আমাদের বাড়ি, ঘর, দোর পথ ঘাট এমন নোংরা হয়ে উঠল কেন?'

পিংকির মা বলল, 'সাফাইওয়ালারা সব ঠিক ঠাক কাজ করে না বলে। মানুষের বদভ্যাস ক্রমে বেড়েই চলেছে বলে। যে যা পারে যেখানে সেখানে ফেলে বলে।'

– কিন্তু সে তো আমাদের পুরনো বদভ্যাস। অথচ তার মধ্যেও তো আমাদের রাস্তাঘাটগুলো কেমন সুন্দর থাকতো।

– 'তাইতো!' কিন্তু ওসব এতকাল তাহলে সাফ করে দিতো কারা?

– 'কেন কাক, কী পাখিতে, কুকুরে, চিলে, শকুনিতে।'

– 'কিন্তু তাদের তো কাউকেই এখন দেখতে পাচ্ছি না। তারা সব গেল কোথায়? সকালে একটা কোকিল গান শোনাতো। গাছের ডালে চড়ুই নাচত। শালিক নাচত। তারাই বা সব গেল কোথায়?'

পিংকি বলল, 'ওদের কী তবে রাগ হল?'

– হতে পারে। পিংকির বাবা বলল, ওদের সঙ্গে তো আমরা কেউই তেমন ভাল ব্যবহার করিনা। ওরাও যে আমাদের বন্ধু, সে কথাটা তো আমরা মনেই রাখিনা।

পম এইসব শুনে টুনে খাটের তলায় বসে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল।

ঈষিকা গুহ

কবি শামসুর রাহমানের সাক্ষাৎকার

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি তিনি– কবি শামসুর রাহমান। বাংলা সাহিত্যে যে ক'জন কবি সময়কে জয় করে যুগান্তর বেঁচে থাকার সাধনায় সফল, তিনি তাঁদেরই একজন। সাহিত্যের বিশাল ক্যানভাসে তাঁর নিত্য আনাগোনা। আমাদের শিশু সাহিত্যেও তাঁর সমান সাফল্য– নিঃসন্দেহে।

১৯৭৪ সালে 'এলাটিং বেলাটিং' প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিশু সাহিত্যে এই দিকপালের যাত্রা শুরু। এরপর প্রকাশিত হয়– 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো' (১৯৭৭), 'গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে' (১৯৭৭), 'রংধনুর সাঁকো' (১৯৯৪), 'লাল ফুলকীর ছড়া' (১৯৯৫), 'নয়নার জন্য' (১৯৯৭), 'ছড়া সমগ্র' (১৯৯৮), 'সবার চোখে স্বপ্ন' (২০০১) প্রভৃতি শিশুতোষ ছড়া-কবিতার বই। এছাড়াও 'স্মৃতির শহর' নামে একটি স্মৃতিচারণমূলক শিশুতোষ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৯ সালে। এখনো সমান গতিতে কবিতার পাশাপাশি ছড়া ও কিশোর কবিতা রচনা করে আমাদের শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন কবি শামসুর রাহমান।

এবার আসি একটু অন্য প্রসঙ্গে। আমরা সবাই জানি– আগামী ২৪শে অক্টোবর কবির ৭৩ বছর পূর্ণ হবে। তিনি ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানে তাঁর নানার বাড়ি। আমাদের মত তাঁর শৈশব ও ছিল অনেক ঘটনাবহুল। তিনি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক রচনা 'কবি হওয়ার গল্প'-তে লিখেছেন–

'আমার ছেলেবেলা যে মহল্লাতে কেটেছে, সেই মহল্লার দু'তিনটি জিনিস আমাকে খুব আকর্ষণ করতো। একটি হলো-- এক আস্তাবল; আমি যে গলিতে জন্মেছি সেই গলির মুখেই একটি ঘোড়ার আস্তাবল ছিলো। সেই ঘোড়ার গাড়ি, সেই সহিস, কিংবা কোচওয়ান– এরা থাকতো, আর কয়টি ঘোড়া থাকতো সেখানে। এসব আমার দেখতে ভালো লাগতো। আরেকটি হলো– একটা ল্যাম্পপোস্ট। তখনতো ইলেকট্রিসিটি ছিলো না। এক বাতিওয়ালা এসে সন্ধ্যায় কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতো। এই বাতিওয়ালাটাকে আমার কাছে যাদুকরের মতো মনে হতো।'

ছেলেবেলার অনেক কিছুই আকর্ষণ করে মানুষকে। কবিও মানুষ তাঁর শিশুকালও আর দশজনের মতোই। তবে এ সব কিছুই তাঁর জীবনের সঞ্চয়– যা পরবর্তীকালে সাহিত্যের উপকরণ হয়ে যায়, অন্যের আনন্দের খোরাক হয়। চিন্তা করে দেখো– এই বড় কবির ছোটকালও ছিল আমাদের মতই। বড় হয়ে তিনি তাঁর ছোটকালের অভিজ্ঞতা ও বর্তমানের অনুভবকে সম্বল করে আমাদের জন্য তৈরি করে চলেছেন ছড়া ও কিশোর কবিতার স্বপ্নময় জগৎ।

বাংলা সাহিত্যে সার্বিক অবদানের জন্য তাঁর পুরস্কার প্রাপ্তি ও কিন্তু কম নয়। রাষ্ট্রীয় সকল সম্মান তিনি ইতোমধ্যে পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১), কবিশ্রেষ্ঠ উপাধি (২০০১) এবং সম্মানসূচক ডি.লিট. ডিগ্রী।

এক ছুটির দিনে সময় করে গিয়েছিলাম তাঁর বাসায়। উদ্দেশ্য ছিলো– 'উড়োজাহাজ'-এর পাঠকদের জন্য তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ। চলো শোনা যাক, শিশু সাহিত্যে তাঁর বিচরণ ও অবদান সম্পর্কে তাঁরই অভিমত–

ঈষিকা গুহ ঃ

আপনি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি। শিশুতোষ ছড়া/কবিতা, গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা ইত্যাদি রচনা করলেও আপনি মূলত কবি। তবে, আজ শুধু শিশুসাহিত্য বিষয়ে আমরা কথা বলব।

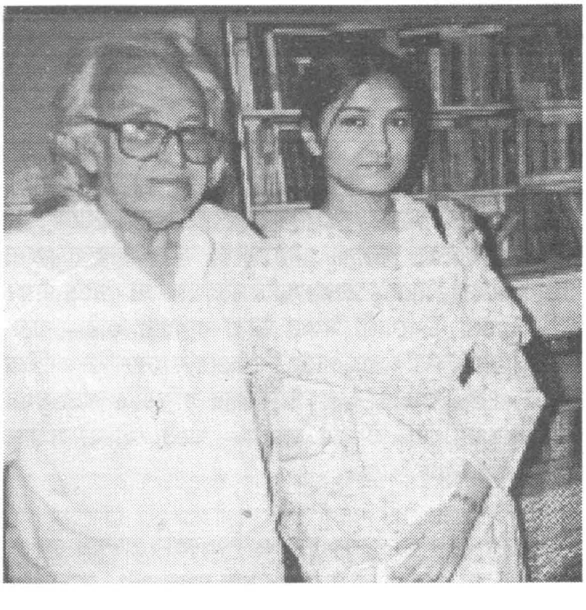
প্রথমেই জানতে চাই– শিশুসাহিত্য রচনায় আপনি কিভাবে মনোযোগী হলেন?

শামসুর রাহমান ঃ

আজ থেকে বেশ আগে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় বের হত 'হুল্লোড়' নামে ছোটদের পত্রিকা। অনেকটা ফয়েজ আহমদের অনুরোধের চাপেই প্রথম ছড়া লিখি 'হুল্লোড়'-এর জন্য। খুব একটা ভালো লেখা ছিলো না সেটা। পরে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর শিশুসাহিত্যের পাতা 'সাত ভাই চম্পা'য় লিখলাম। তখন পাতাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আফলাতুন। তাঁর অনুরোধে ও তাগাদায় লিখলাম বেশ কয়েকটি ছড়া। এভাবেই শিশুসাহিত্যের জগতে আসা।

ঈষিকা ঃ

আপনার স্মৃতিচারণে আমরা জেনেছি– কাব্যজগতে আপনার আগমণ হঠাৎ করেই। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী অনেকটা অজান্তেই। শিশুসাহিত্যের বেলায় দেখি তার উল্টো, বলা যেতে পারে অন্যের অনুরোধে জেনেশুনে লিখতে আসা। এটাকে



একরকম প্রস্তুত হয়ে আসাই তো বলা যায়, তাই নয় কি?

শা. রা. ঃ

বলতেই পারো। পরে নিজের তাগিদেই লিখে গেছি। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে সম্পাদকরা লেখা চাইতে লাগলেন। মনে পড়ে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই 'কচি-কাঁচা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করতেন। দাদাভাইয়ের পত্রিকার জন্যও লিখতে হলো। তাঁর তাগিদও ছিলো। 'টাপুর টুপুর' নামে আরো একটি ভালো পত্রিকা সম্পাদনা করতেন বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক এখ্লাসউদ্দিন আহ্মদ। তাঁর অনুরোধেও কিছু ছড়া লিখেছি। সে পত্রিকায় ছোটদের জন্য ধারাবাহিক রচনাও লিখেছি– আমার জন্মস্থান ঢাকা শহর নিয়ে 'স্মৃতির শহর।'

ঈষিকা ঃ

আপনার প্রধান সাধনা নিশ্চয়ই কবিতা, নিজের মনের তাগিদে লেখা– যা আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি। শিশুতোষ ছড়া লেখার জন্যও কি সমান তাগিদ বোধ করেন?

শা. রা. ঃ

আমি সময় পেলেই লিখি। এখন শিশুদের জন্য ও লেখার তাগিদ বোধ করি।

ঈষিকা ঃ

শিশুদের জন্য লেখার ব্যাপারে বিশেষ কোন পরিকল্পনা আছে কি?

শা. রা. ঃ

সেরকম কোন পরিকল্পনা আমার নেই। নিজের তাগিদে যখন যা মনে হয়– লিখে যাই।

ঈষিকা ঃ

আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা সুকুমার রায়ের ছড়া/কবিতা পড়ে শিশু মনস্তত্ত্বের যে অনুশীলন দেখি– আপনি এই বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার তাগিদ বোধ করেন কি?

শা. রা. ঃ

আমি বিশেষ কোন বিষয়ের তাগিদে লিখিনা। আমি, মনে যা আসে তা-ই লিখি। তাতে শিশুরা আমার লেখা পড়ে হয়ত আনন্দ পায়, নিশ্চয় তারা যা চায় তার কিছু কিছু পায়– তাই আমার লেখা পড়ে। আমি আমার লেখার চাহিদা ঠিকই বুঝতে পারি।

ঈষিকা ঃ

লেখাকে শিশুদের উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে আপনি কিভাবে নিজেকে তৈরি করেন?

শা.রা. ঃ

অনেকে মনে করেন শিশুরা অপরিণত, কিছুই বোঝে না। আসলে ছোটদেরও আলাদা একটা জগৎ আছে, নিজস্ব কল্পনা শক্তি ও মেধা আছে। তারা সবকিছুতে আনন্দ পেতে চায়। আমি তাদের উপযোগী সহজ ভাষা ব্যবহার করি– যাতে তারা আমার লেখা বুঝতে পারে, নিজেদের কল্পনাশক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। তাছাড়া ছড়া বা কিশোর কবিতা লেখার সময় আমি প্রাধান্য দেই স্বরবৃত্ত ছন্দকে– যাতে ছোটরা সহজে তালটা ধরে নিতে পারে।

ঈষিকা ঃ

শিশুদের আনন্দ দেওয়া ছাড়াও শিশুতোষ রচনার ক্ষেত্রে আলাদা কোন উদ্দেশ্য কি আপনার মনে কাজ করে– সামাজিক বা রাজনৈতিক?

শা.রা. ঃ

শিশুদের আনন্দদানই আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য। আনন্দের পাশাপাশি কোন কোন লেখাতে কষ্টের কথাও থাকে। আবার শিশুদের জন্য লেখা ছড়ায় সামাজিক বা রাজনৈতিক ইঙ্গিতও অনেক সময় থাকে, তবে তা ছড়াটিকে গ্রাস করে নয়– ঃ হালকাভাবে।

ঈষিকা ঃ

আজকাল ছড়ায়ও প্রতিবাদের কথা এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছড়া শুধু বড়দের পাঠোপযোগী হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে ছড়াকে কি আলাদাভাবে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয় না?

শা.রা. ঃ

শিশুদের মন যা চায়, যার প্রতি তাদের আকর্ষণ– তা নিয়েই লেখা উচিৎ। শিশুদের কল্পনা যেন প্রসারিত হবার সুযোগ পায়– লেখা সেরকম হওয়া ভালো। প্রতিবাদ ছড়ায় আসতেই পারে, তবে তা যেন প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়– প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। নতুবা শিশুদের কল্পনার জগৎ নষ্ট হয়ে যায়।

ঈষিকা ঃ

বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

শা.রা. ঃ

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেকেই ভালো ছড়া লিখছেন। অনেকে লিখতে পারলেও লিখছেন না। শুধু শিশুদের আনন্দদানের জন্য যে লেখা, অনেকেই তা লিখছেন না; বরং রাজনৈতিক--সামাজিক বিষয় এসে লেখায় একঘেঁয়েমি এসে যাচ্ছে। আমি মনে করি, শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশুদের আনন্দদানের বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার। আর বাংলাদেশের ছড়া সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কীইবা বলা যায় এ মুহূর্তে--আশাবাদী হওয়া যায়।

ঈষিকা ঃ

বাংলা ভাষার প্রধান কবিদের কেউ কেউ কবিতার পাশাপাশি সমান দক্ষতায় শিশুসাহিত্যে মনোযাগী ছিলেন, এখনো কেউ কেউ আছেন। শিশুসাহিত্যে মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারে উত্তর প্রজন্মের কবিদের প্রতি আপনার কোন পরামর্শ আছে কি?

শা.রা. ঃ

আসলে কোন বাধ্য-বাধকতা নিয়ে লেখা হয়ে ওঠে না। শিশুদের জন্য সবাইকে লিখতে হবে এমন কোন কথা নেই। বাধ্য করে এটা করানো যায় না। শিল্পী একজন স্বাধীনচেতা সচেতন মানুষ। তিনি মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না নিয়ে মানবিকবোধে যখন তাড়িত হন, তিনি তখন আপন তাগিদে সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটান। তাই বলে সবকিছু শিশুসাহিত্যে ঢুকানো ঠিক নয়। যে যেভাবে যা কিছু অনুভব করেন, তা আপন স্বভাবে লেখায় ফুটিয়ে তুলবেন। জোর করে শিশুসাহিত্যে মনোযাগী হতে হবে এমন কি কথা আছে! সাহিত্যের কোন শাখায় মনোযাগী হওয়া বা না হওয়া লেখকের নিজস্ব ব্যাপার।

এতক্ষণ এই সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য কবিকে 'উড়োজাহাজ'-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হলে, কবি শামসুর রাহমান 'উড়োজাহাজ'-এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা কামনা করেন এবং প্রতি উত্তরে ধন্যবাদ জানান।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেবেলার গল্প

মা ভাবতেন ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার হবে। বাড়িতে একজন ডাক্তার থাকার সুবিধে অনেক। বাবার ইচ্ছে অন্যরকম। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার করবেন। অঙ্কে যার অমন মাথা সে ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে যাবে কোথায়।

তাই বাবা-মা দুজনেরই কড়া নজর ছিল ছেলের ওপর। মুম্বাই-এর শিবাজী পার্কের কাছে ওদের বাড়ি। অন্যরা যখন ব্যাট হাতে নিয়ে বল পিটোচ্ছে কিংবা ফুটবল খেলছে সে তখন ঘরে বসে পড়ছে, অঙ্ক কষছে। বাবা বলতেন, ভালো ছেলেরা ঐভাবে খেলে সময় নষ্ট করে না। সময় হচ্ছে সোনা। তাকে কাজে লাগাতে হয়। মা বলতেন, বড় হয়ে যে ডাক্তার হবে তার কি ঐভাবে খেলার মাঠে সময় নষ্ট করা পোষায়!

ছেলেটার কিন্তু খেলার জন্যে প্রাণ বেরিয়ে যেত। চান্স পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস বলে ক্রিকেট খেলত। কিন্তু তার নিজের না ছিল ব্যাট, না ছিল একটা বল। সেই জন্যে ওর মনে খুব কষ্ট। একদিন কথাটা বাবাকে বলে ফেলেছিল। ছেলের কথা শুনে গম্ভীর মুখে বাবা বলেছিলেন, তুমি যদি পরীক্ষায় অঙ্কয় একশর মধ্যে একশ পাও তাহলে তোমায় একটা ব্যাট কিনে দেবো।

তখন আর তাকে পায় কে! ক'মাস বাদে পরীক্ষা। অঙ্ক নিয়ে মেতে রইল সে। অঙ্কয় তাকে একশ পেতেই হবে। তাহলে বাবা ব্যাট কিনে দেবেন। তার নিজের ব্যাট হবে। সুতরাং অঙ্কয় তাকে একশর মধ্যে একশ পেতেই হবে। দেখতে দেখতে এসে গেল পরীক্ষার সময়। অঙ্ক পরীক্ষাও একদিন হয়ে গেল। খুব ভালো হয়েছে তার পরীক্ষা। ফার্স্ট সে প্রত্যেকবারই হয়। অঙ্কয় একশর মধ্যে একশ কোনোদিন পায়নি। এবার কি পাবে? রেজাল্টও বেরিয়ে গেল একদিন। যথারীতি ফার্স্ট হয়েছে সে। আর অঙ্কয় পেয়েছে একশর মধ্যে একশ।

বাবার সামনে গিয়ে হাসি মুখে দাঁড়াল সে। হাতে রেজাল্ট কার্ড। বাবা জিগ্যেস করলেন, কি হলো, অসময়ে যে!

ছেলেটি মার্কশিটটা এগিয়ে দিলে।

কি এটা?

রিপোর্ট কার্ড।

কিসের রিপোর্ট?

পরীক্ষার। আমি অঙ্কয় পুরো মার্কস পেয়েছি।

একশর মধ্যে একশ!

হ্যাঁ!

বাবা ছেলেটির পিট চাপড়ে দিয়ে বললেন, ওয়েল ডান।

সেদিনই অফিস থেকে ফেরার সময় ব্যাট কিনে আনলেন ছেলেটির বাবা। ভালো ব্যাট। অস্ট্রেলিয়ার নিল হার্ভের অটোগ্রাফ দেওয়া ব্যাট।

ব্যাট তো নয় ছেলে যেন হাতে স্বর্গ পেল। এতদিন তার নিজের ব্যাট হলো। পরে ছেলেটি একদিন কথা প্রসঙ্গে আমায় বলেছিলেন, ব্যাটটা হাতে নিয়ে সেদিন যতটা খুশি হয়েছিলাম, যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম, বড় হয়ে ওভাল টেস্টে ইংলন্ডকে হারিয়েও ততোটা পাইনি।

স্কুলে পড়ার সময় ক্রিকেট ব্যাট-বলে হাত দেবার সুযোগই পায়নি সে, খেলা তো দূরের কথা। প্রথম সে ক্রিকেট খেলল এলফিনস্টোন কলেজে পড়ার সময়। মুম্বাই এর দারুণ নাম করা কলেজ এলফিনস্টোন। ওদের ক্রিকেট টিমটাও খুব শক্তিশালী। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ও সুনীল গাভাসকারের মামা মাধব মন্ত্রী ছিলেন কলেজ ক্রিকেট দলের কোচ। কোচ হিসেবে তিনি ছিলেন ভীষণ কড়া।

ক্রিকেট-ট্রিকেট আগে না খেললে কী হবে ছেলেটির হাতের টিপ ছিল অসাধারণ। আমের সময় ছুটির দিন হলেই সে তার সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে হাজির কোনো বাগানে। যে কোনো কোণ থেকে এক ঢিলে দু চারটে আম সে অনায়াসে পেড়ে ফেলত। শিবাজী পার্কে খেলার সময় যে কোন অ্যাঙ্গেল থকে বল ছুঁড়ে সে উইকেট ভেঙে দিত। ওর এই গুণের কথা জানত এলফিনস্টোন কলেজের ক্যাপ্টেন ইয়াসিন রেলে। তাই তাঁর বড় ইচ্ছে, ছেলেটি কলেজটিমের দ্বাদশব্যক্তি হোক। মাধব মন্ত্রীকে সে কথা বলেও বলে রাখলেন রেলে।

কিন্তু কলেজের নেটে যেতে ওর রোজই দেরি হয়ে যেত। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিকাল ক্লাসে কাজ করতে করতে ওর দেরি হয়ে যায়। মাধব মন্ত্রী রেগে টং। নেটে আসতে রোজ লেট। ও ছেলেকে কি দলের দ্বাদশব্যক্তি করতে আছে!

সেদিন ঘটল এক কান্ড! কলেজের দ্বাদশ ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার পক্ষে খেলা সম্ভব নয়। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন ক্যাপ্টেন। তিনি ডেকে পাঠালেন ছেলেটিকে। যে ডাকতে গিয়ে ছিল সে ল্যাবোরেটারি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখল, মনের আনন্দে ছেলেটি কী সব করছে। ওকে ডেকে ফিরে গেল ছাত্রটি। ও খুব একটা দেরি করল না। হাতের কাজ সেরে সোজা গিয়ে হাজির হলো মাঠে। ওকে দেখে একজন খেলোয়াড় বলে উঠল, আরে ঠিক সময়েই এসেছো দেখছি। লাঞ্চ খাবে আবার পকেটমানিও পাবে।

কথাটা ছেলেটির মনে বড় লাগে। কান দুটো লাল হয়ে ওঠে। এ কী অপমান। এই অপমানের জবাব মুখে নয় হাতের ব্যাট দিয়ে দেবে বলে ঠিক করল ছেলেটি। সে যে ভালো খেলতে পারে, ক্রিকেট খেলায় যে কারো চেয়ে কম নয় তা সে দেখিয়ে দেবে। আর তাই হবে এই অপমানের জবাব। সেই দিন থেকে শুরু হলো ছেলেটির অনুশীলন। সে যা করে মন দিয়ে করে। অনুশীলনেও কোনো ফাঁকি রইল না। সেই সঙ্গে পড়াশোনাও চলল সমান তালে।

পড়াশোনার সুবিধের জন্যে এলফিনস্টোন কলেজ ছেড়ে সে এসে ভর্তি হলো রুইয়া কলেজে। খেলতে শুরু করল কলেজ টিমে। তবে ব্যাটসম্যান নয় বোলার হিসেবে। কলেজের হয়ে প্রথম খেলায় ছটি উইকেট দখল করে সে তাক লাগিয়ে দিলো। পরের ম্যাচে সে দেখিয়ে দিলো ব্যাটসম্যান হিসেবেও সে কারো চেয়ে কম নয়। ফলে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়

সে ডাক পেয়ে গেল মুম্বাই এর হয়ে খেলার জন্যে। আর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সে করল ৩২৪ রান। তার আগে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে তার চেয়ে বেশি রান কেউ করতে পারেনি।

ঐ একটি ইনিংসের জোরেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। চান্স পেয়ে গেল মুম্বাই দলে। রনজি ট্রফিতে সার্ভিসেস দলের পক্ষে খেলতে নামল সে। পলি উমরিগর দলের অধিনায়ক। এতদিন শুধু ওঁর নাম শুনেছে সে। কাগজে ছবি দেখেছে। আর এখন তাঁর সঙ্গে খেলছে। প্রথম ম্যাচে আশির ওপর রান করল সে। দ্বিতীয় ম্যাচ বাংলার বিরুদ্ধে। সেই খেলাতেও আশির ওপর রান।

এরপর আর কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি ছেলেটিকে। চান্স পেল পশ্চিমাঞ্চল দলে। সেখানেও দারুণ খেলল। ফলে খুলে গেল টেস্ট ক্রিকেটের দরজা। যার জন্যে যে কোনো খেলোয়াড়কে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় মাত্র এক বছরের মধ্যে সেই পথ পার হয়ে এল সে। খেলল টেস্ট। সেখানেও সাফল্য। তারপর একদিন সে হলো ভারতীয় দলের অধিনায়ক।

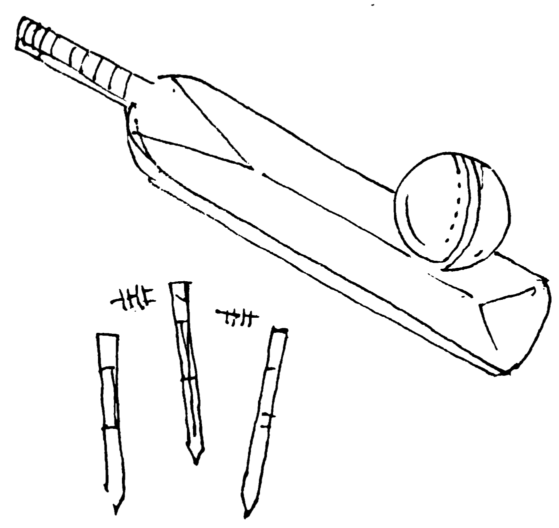
অধিনায়ক হিসেবেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সে। ১৯৭১ সালে মনসুর আলি খান পতৌদিকে সরিয়ে তাকে দলনেতার পদ দেওয়া হলো। সেবার সে দল নিয়ে ওয়েস্টইন্ডিজে গেল। সুনীল গাভাসকারের টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকও হলো সেইবার। গ্যারি সোবার্সের ওয়েস্টইন্ডিজকে হারিয়ে রাবার জিতল ভারত। তারপর সে তার দল নিয়ে গেল ইংলন্ডে। সেখানেও সাফল্য। ওভাল টেস্টে জিতে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার পেল ভারত। পরপর দুটি বিদেশ সফর এবং রাবার জয়। ভারতীয় ক্রিকেট এমন সাফল্যের মুখ আর কখনো দেখেনি।

ছোট্ট একটি কথার জবাব দিতে গিয়ে সেই ছেলেটি হয়ে গিয়েছিল ভারতের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান এবং লাকি ক্যাপ্টেন।

সেদিনের সেই ছেলেটি কে?

অজিত লক্ষ্মণ ওয়াদেকার।

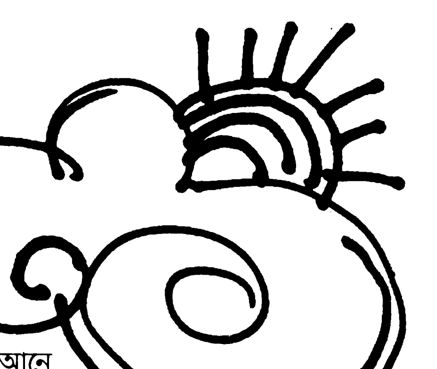
ভারতের সফল ব্যাটসম্যান, সফল ক্যাপ্টেন, সফল ম্যানেজার। না, ডাক্তার কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কোনটাই সে হয়নি। হয়েছিল বড় ক্রিকেটার এবং স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার।



কবিতা ছড়া

রতনতনু ঘাটী

রূপকথা

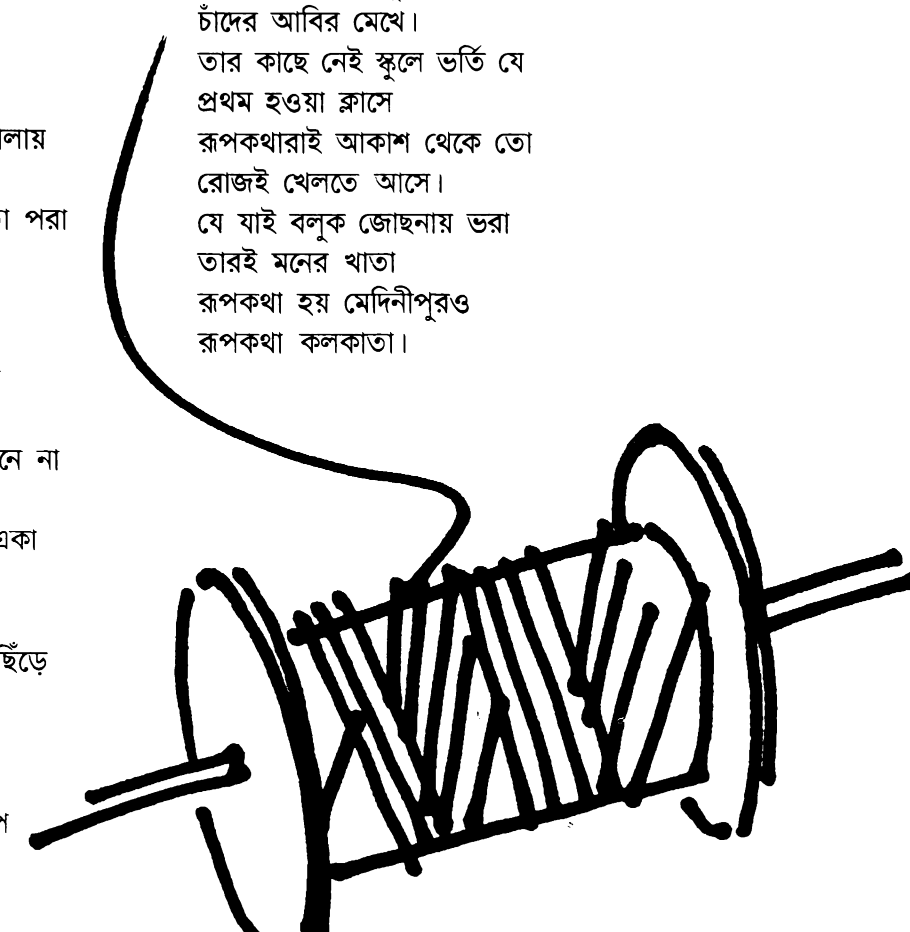


যে ছেলেটি শুধু ঘুড়িই ওড়ায়
লাটাই পায় না খুঁজে
উড্ডীন দুটো চোখে সে যে তাল
পাতার চশমা গুঁজে
নারকোল পাতা হাতঘড়ি দেখে
সময়কে বলে, 'আছি!'
বিকেল বেলার সূর্যটা মেঘে
খেলছিল কানামাছি।
ঘুড়ির মাথায় কাগজ-ভোমরা
একটানা বাজে ভোঁ-ভোঁ
সুতোয় দু'কান পেতে শোনে আর
ভাবে– আকাশটা ছোঁবো।
কদম গাছের ডাল ভেঙে কাল
পুঁতেছিল খালপাড়ে
আজ সে উপড়ে দেখছে কতটা
নতুন শেকড় বাড়ে।
পদ্মদিঘিতে সাঁতরে তুলেছে
পাঁচ-ছ'টা লাল-সাদা
কপালের পাশে পদ্মরেণুতে
লেগে আছে তার কাদা।

ওকে দেখলেই খোলা জানালায়
ছিটকিনি দাও তুলে
মানায় না ওকে জামা-জুতো পরা
বাবুসোনাদের স্কুলে।
এসব কথাই বাবা বলেছেন
মাও বলেছেন তাই?
রংহীন তবু রঙে রঙে মাখা
ওর ছেলেবেলাটাই।
নামতা শেখেনি, ছড়াও জানে না
ইংরেজি সে তো দূর
হারানো টায়রা খুঁজে দেয় একা
বোসেদের কুক্কুর।

সকালে উঠেই কেয়াপাতা ছিঁড়ে
নৌকো ভাসায় ও যে
আকাশ পারের মন্দাকিনীরা
ঢেউ দিতে ওকে খোঁজে।
ইচ্ছে করেই ভুল ট্রেনে চেপে
চলে যায় চাইবাসা
তালগাছে উঠে একা পেড়ে আনে
বাবুইপাখির বাসা।
একটা পেয়ারা পায় যদি গাছে
ভাগ করে পাঁচজনে
গাছের ছায়ায় কাচপোকা খোঁজে
বাতাবি লেবুর বনে।
ফড়িং ধরে সে সারাটা দুপুর
নাওয়াখাওয়া যায় ভুলে
জজসাহেবের মেয়ের ফ্রকের
চোরকাঁটা দেয় তুলে।

সকাল দুপুর টই টই টই
সন্ধেবেলায় চোখে
ঘুমপরিরা যে বিছনাই পাতে
তিনটে চারটে লোকে।
সামনে টিভির একশো চ্যানেল
দেখছ কখন থেকে
সেই যে ছেলেটি ঘুমোয় তখন
চাঁদের আবির মেখে।
তার কাছে নেই স্কুলে ভর্তি যে
প্রথম হওয়া ক্লাসে
রূপকথারাই আকাশ থেকে তো
রোজই খেলতে আসে।
যে যাই বলুক জোছনায় ভরা
তারই মনের খাতা
রূপকথা হয় মেদিনীপুরও
রূপকথা কলকাতা।



প্রমোদ বসু

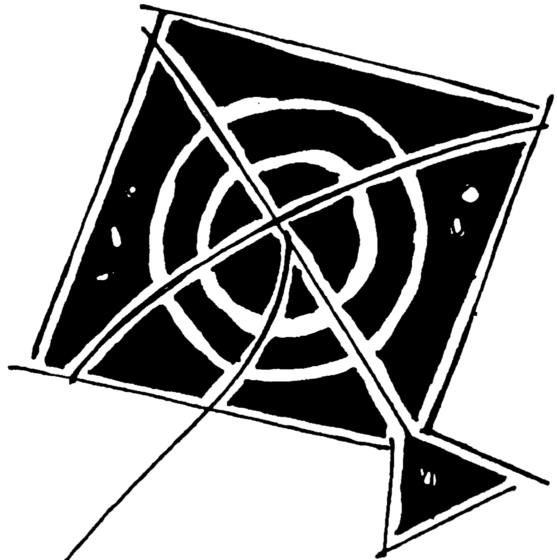
কবির কাছে

একটি কথা ভাব লিখে যায়,
একটি লেখে ছন্দ।
একটি ফুলে রূপ দেখি, আর
একটিতে পাই গন্ধ।

একটি মুখে বিষাদ দেখি,
একটিতে বা আনন্দ;
একটি মনের স্বচ্ছ দিশা,
একটি তো ভাই ধন্দ!

একটি আকাশ নিবিড় কালো
একটি খুশির অঙ্গ,
একটি জীবন নিটোল ভরাট,
একটি যে নিঃসঙ্গ!

কিন্তু কারোর জন্যে কবির
দুয়ার তো নয় বন্ধ,
সবাই ভাল কবির কাছে,
কক্ষনও নয় মন্দ।



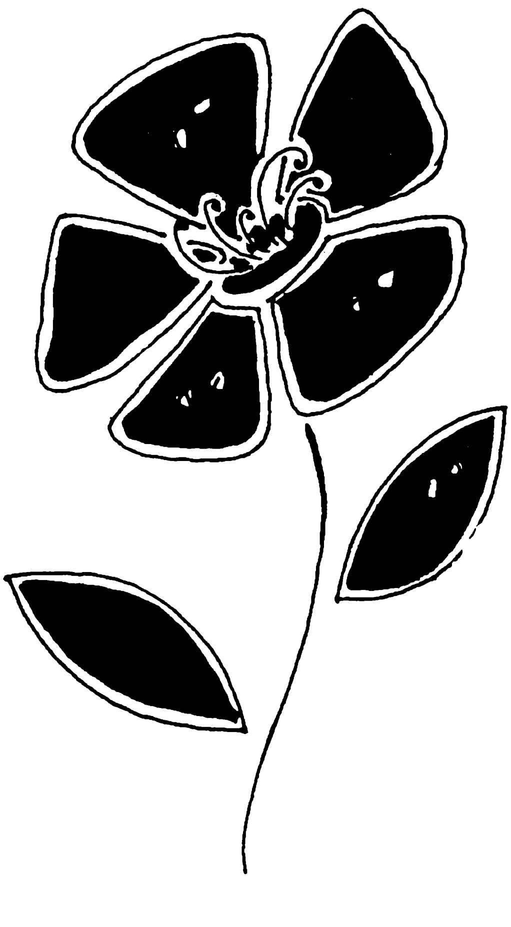
কার্তিক ঘোষ

ছোট্টবেলা

বকুলতলার মাঠ পেরোনো
ছোট্টবেলা, ছোট্টবেলা—
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে
লাটাই-ঘুড়ি, বদরমেলা।
দুপুরবেলার উধাও আকাশ
বিকেলবেলা পাতার টুপি,
সুধার জন্যে পাখির পালক
কুড়িয়ে নিতুম চুপিচুপি।
ফুল কুড়োনো শিউলি সকাল
রাংতা মোড়া আখাশখানা,
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে
জোছ্না মাখা হাসনুহানা।

ছোট্টবেলা, ছোট্টবেলা,
এখন তুমি কোথায় থাকো?
উসকোচুলে আর কী এখন
গন্ধলেবুর গন্ধ মাখো!
সুধাও কি সেই তেমনি আছে
কথায় কথায় মিথ্যে আড়ি—
টগর কুঁড়ির নোলক নাকে,
কোথায় যেন শ্বশুরবাড়ি?

ছোট্টবেলা, ছোট্টবেলা,
চুপটি কেন? যা হোক বলো–
ভাল্লাগে না বাক্সোবাড়ি,
তারচে কোথাও পালাই চলো।



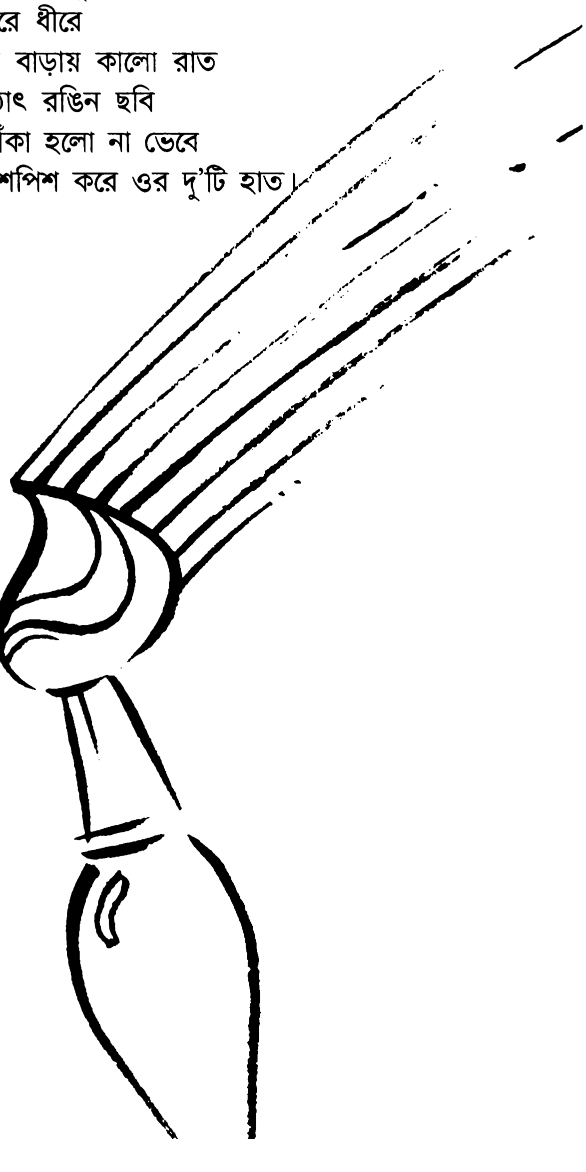
নাসির আহমেদ

সাতরঙে ঝিলমিল

রংধনু ঝিলমিল
বেগুনি, হলুদ, নীল
সবুজ, আকাশি, লাল, কমলা।
কোন রঙটা যে ভালো
সবচেয়ে বেশি আলো
ভেবেই পায় না খুকু অমলা।

ভাবনা-তুলিতে মেখে
কোন্ রঙে ছবি এঁকে
সাজাবে পড়ার ঘর
ভাবনায় কাটে বেলা
হঠাৎ সন্ধেবেলা
কেটে যায় ভাবনার ঘন ঘোর।

সব রঙ মুছে গিয়ে
ধীরে ধীরে
পা বাড়ায় কালো রাত
হঠাৎ রঙিন ছবি
আঁকা হলো না ভেবে
নিশপিশ করে ওর দু'টি হাত।



সৈয়দ আল ফারুক

আমার অনেক কাজ

আমার অনেক কাজ রয়েছে বাকি
এই কথাটা জানার পরে আমি
কীভাবে আর নিজেকে দিই ফাঁকি!
ঘর-কুনো ব্যাঙ একলা-একা শুয়ে-বসে থাকি–
কক্ষণও না, এ-পাগলামো, কক্ষণও হয় নাকি?

উঠে দাঁড়াই ঘুরে দাঁড়াই, নিজের পায়ে দাঁড়াই
পুরনো কাজ শেষে নতুন কাজে দু হাত বাড়াই
আমার অনেক কাজ রয়েছে বাকি
এই কথাটা জানার পরে আমি
বুঝতে পারি– সময়, সে তো সোনার চেয়ে দামি।

আমার অনেক কাজ
কাল-পরশু করবো না হয়–
কক্ষণও না, আজ
আজকে মানে এখনি
রক্তে আমার কাজের নেশা
দেখেছো কেউ দেখোনি
নেই বিশ্রাম নেই অবসর
কাটাই না আর ছুটি
কাজের মাঝে ডুবে আছি
ভালোই, মোটামুটি।

আজ শনিবার কাল রবিবার
আমার কাছে প্রতিটি দিন একই মাপের, সমান
আমি হেসেই ছুঁড়ে ফেলি
এমন কথা 'শুক্রবারে কাজ কিছুটা কমান'
বৃহস্পতি, শুক্র
প্রতিটি দিন, দিনকে আমি করি হাজার টুকরো
আর প্রতিটি টুকরো আমি
কাজে লাগাই, কাজে
কাজ ছাড়া আর নেই কোনো কাজ
থাকি কাজের মাঝে
আমার অনেক কাজ রয়েছে বাকি
এই কথাটা জানার পরে আমি
বুঝতে পারি– সময়, সে তো হীরের চেয়ে দামি।

নেই অবসর নেই বিশ্রাম
আমার কোনো ছুটি নেই
বন্ধুরা সব হাসে : সৈয়দ
আল ফারুক আর দুটি নেই!



দীপ মুখোপাধ্যায়

দুষ্টু ছেলে

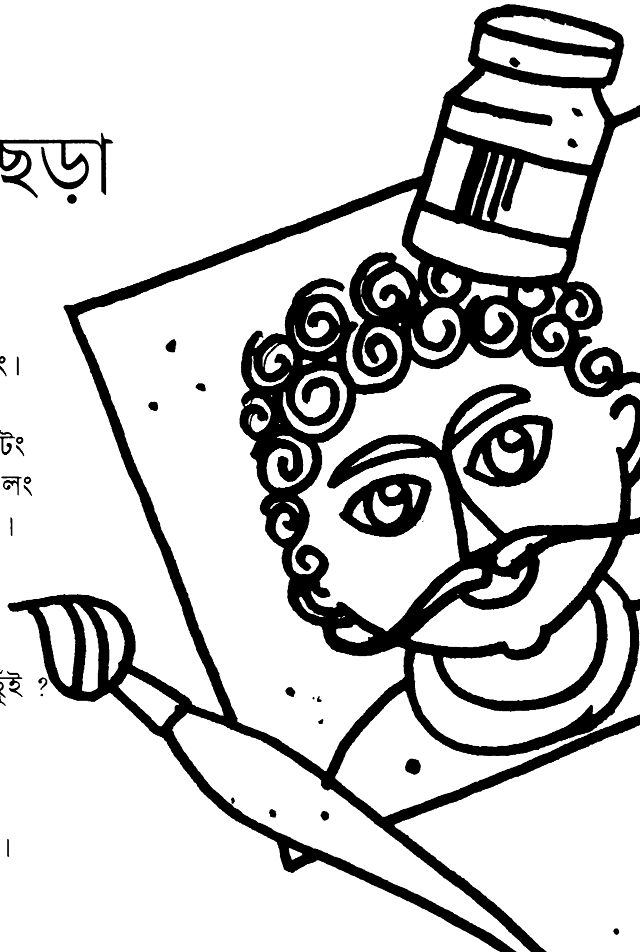
দুষ্টু ছেলে অঙ্ক ক্লাসে
সবাইকে মুখ ভেঙায়
দেখতে পেয়ে বেত দিয়ে স্যার
তাই বেধড়ক ঠ্যাঙায়।

জায়গা হবে জঙ্গলে তোর
হবেই অধঃপতন
মুখ ভেঙালে দেখতে হবি
বনমানুষের মতন।

জটিল ব্যাপার এসব অনেক
সত্যি গো ছাই বুঝি
বললে ছেলে মুখটা স্যারের
এমনটা তাই বুঝি?

প্রদীপ আচার্য

পালোয়ানি ছড়া



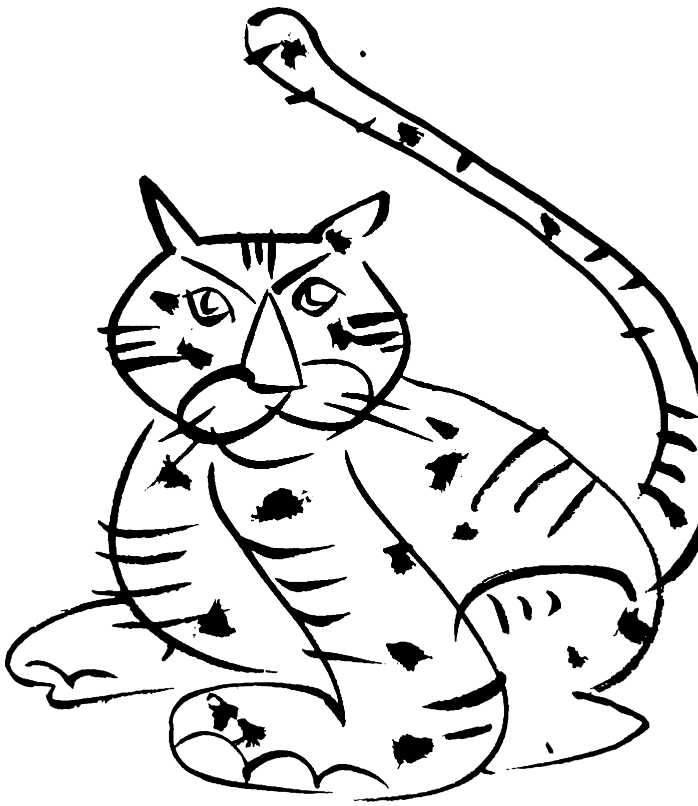
চেহারায় পালোয়ানি ঢঙ
হাতে নিলে তুলি আর রঙ
আঁকো যদি ছবি হবে জব্বর জং।

শুনেই সে পালোয়ান রেগে হল টং
জবাবে সে লেকচার দিয়ে গেল লং
বলল, নিজের কথা ভাবনা বরং।

চেহারায় পালোয়ানি মুই
না হয় আঁকিস ভাল তুই
দোষটা কী হল যদি রঙ তুলি ছুঁই ?

চেহারাটা দুধে ভাতে তোর
নেই গায়ে হাতে পায়ে জোর
মুগুর ভাজতে গেলে খাবি চক্কর।

চেহারাটা নুদুস নাদুস
তোকে দিয়ে কাজ হবে না ধুস
বারোমাসই সর্দি, গলা খুস খুস।



শিহাব সরকার

বাঘ দেখা

সুন্দরবনে গিয়ে অযথাই ঘোরাঘুরি
গাছ আর গাছ শুধু, গোলপাতা ভুরিভুরি

কই গেলো হরিণেরা, বানরের খোঁজ দাও
সবচে বড় কথা, বাঘ নেই কোথাও

মনমরা হয়ে সবে ফিরে যাই লঞ্চে
গান ধরি সারে গামা এলোমেলা মন যে

পরদিন একা গিয়ে ফুল দেখি গেওয়া গাছে
ভয় কী হে, বাঘ নেই। নদী আর হাওয়া আছে

সুনসান দুপুরে গাছতলে ঢুলুনি
দুই চোখে ঘুম নামে, ঝোপে-ঝাড়ে দুলুনি

আচমকা জেগে উঠি বিটকেলে গন্ধে
চোখ মেলে দেখি বাঘ, পড়ি মহা ধন্দে

হায় হায় কী বিপদ, বেঘোরে যে প্রাণ যায়!
বাঘখানা ঠায় বসা, থেকে থেকে গর্জায়

নিরুপায় হয়ে বলি, 'আমি করি কাব্য
বিশ্বাস করো মামা, আজ থেকে ভাববো

কী করে লেখা যায় বাঘ নিয়ে কবিতা
আগামীতে যা লিখি, তোমাকেই সবই তা।'

শুনে মামা হো হো করে হেসে ওঠে দুলে দুলে,
'ঘাসপাতা খাই আমি, মধু খুঁজি ফুলে ফুলে

থাক তুই জঙ্গলে যত খুশি ইচ্ছা',
এই ভাবে পেয়ে গেছি গীনেসের কিচ্ছা।

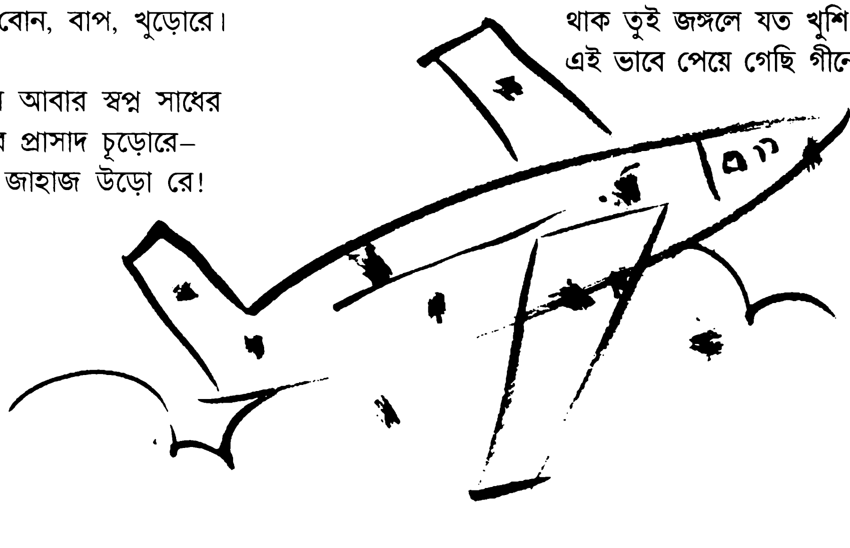
সুকুমার বড়ুয়া

উড়ো জাহাজ

উড়ো জাহাজ উড়োরে
শত বর্ষের বুড়ো রে–
কার পাপে তুই টুইন টাওয়ার
করলি গুঁড়ো গুঁড়োরে!

ভূমিকম্পে জলোচ্ছ্বাসে
বিপন্নরা যখন ভাসে
তোর দয়াতে আবার বাঁচে
ভাই, বোন, বাপ, খুড়োরে।

ভাঙিস আবার স্বপ্ন সাধের
সোনার প্রাসাদ চূড়োরে–
উড়ো জাহাজ উড়ো রে!



পার্থপ্রতিম আচার্য

নক্ষত্রের বাতি



দৌড়ে এলাম কাছে।
যেই শুনেছি সহস্র মাছ
হাঁটছে গাছে গাছে।

মাছ নয়তো সহস্র নীল
নক্ষত্রের আলো ;
গাছের মাথায় মাছ হয়ে আজ
সহসা চমকালো!

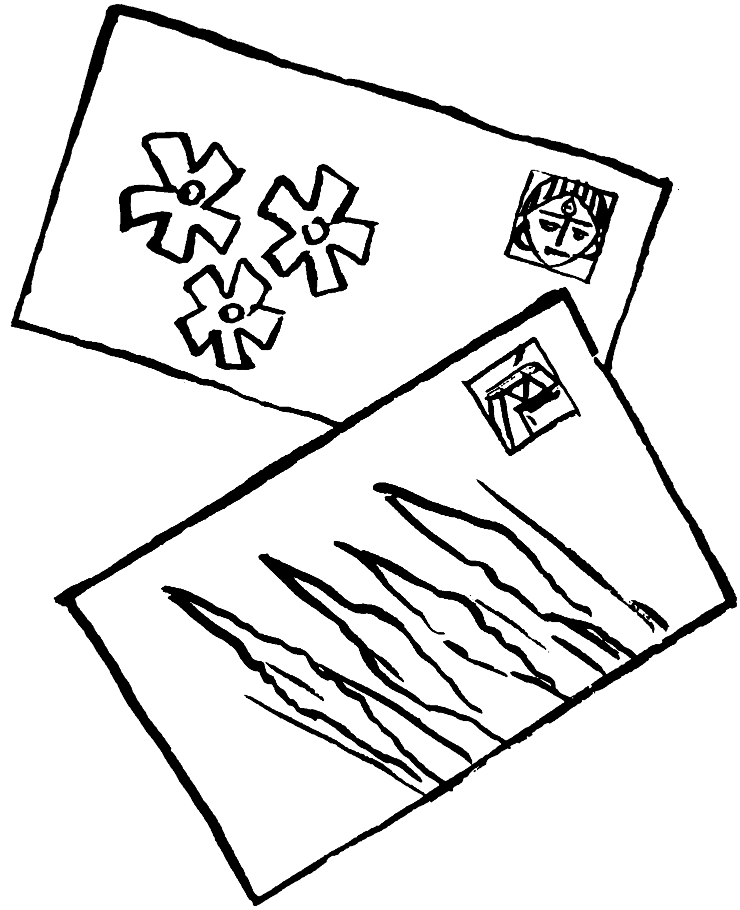
গাছের শাখায় মাছ পাতারা
হাওয়ায় কাঁপে, দোলে।
বাবই দোয়েল বাঁধছে বাসা
একটি গাছের কোলে।

একটি গাছের কোলে, মানে
একটি গাছের শাখায়,
একটি বাড়ির বারান্দাতে
একটি বালক আঁকায়–

মগ্ন এমন, রঙ তুলি তার
ছুটছে সবুজ ঘাসে,
কখন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে
মাছ পাতাদের পাশে!

ওমুক পাতায় পুনর্বসু
ওমুক পাতায় স্বাতী;
পাখির বাসায় জ্বলবে কখন
নক্ষত্রের বাতি ?





গৌতম হাজরা

ছুটির চিঠি

আর কটা দিন কাটলে পরে
ঢাকের বাদ্যি বাজবে,
স্বপ্নগুলো রঙিন সুতোয়
সত্যি দারুণ সাজবে।

ভোরের বাতাস মাতাল হবে
শিউলি ফোটা গন্ধে,
মনটা তখন ধিন্-তা-ধিনা
ছবি ও ছড়ার ছন্দে।

দুলিয়ে চামর কাশের গুচ্ছ
শোনায় আগমনী,
কী জানি ভাই, মনটা কোথায় ?
হালে পাই না পানি।

পেলাম যখন মনের মধ্যে
মা দুগ্গা আসছে,
রঙ ও তুলির ক্যানভাসেতে
ছুটির চিঠি ভাসছে।

মৃণালকান্তি দাশ

গল্প হল শেষ

হিরের পাহাড়, ক্ষীরের নদী,
পান্নাচুনির দেশ–
এক যে রাজা, এক যে রানী,
গল্প এবার শেষ!

ইস, এটা কি গল্প হল!
রাজপুত্তুর কই?
আমি কি আর সেই ঠাকুমা,
বয়সটা নব্বই?

যায় না কুমার পক্ষিরাজে
সাত সমুদ্র পার?
ঢাল-তরোয়াল মিউজিয়ামে,
হাত পা বাঁধা তার!

সোনার কাঠি, রুপোর কাঠির
পাট কি গেছে চুকে?
পাঁচ হাজারি ভরির সোনা
বন্দি যে সিন্দুকে!

কুঁচবরণা রাজকন্যার
গল্প গেলাম ভুলে!
দুলিয়ে বেণী যায় সে এখন
ইংরিজি ইস্কুলে!





আশিস সান্যাল

ঠিক দুপুরে

দুপুরের ফুটপাতে
দেখা যায় যদ্দূর,
চারিদিক থম্ থম্–
কাঠ-ফাটা রোদ্দুর।

ঘরে বসে নিরিবিলি
চোখ ভরা ঘুম,
গল্পের বই পড়ি
পাড়াটি নিঝুম।

ক্রমশ নিথর সব
চলে যাই ভেসে,
ভাবনায় ডুব দিয়ে
যেন দূর দেশে।

অজানা শহর ছেড়ে
আরো অজানায়,
চেনার সীমানা ছিঁড়ে
জানিনা কোথায়?

হয়তো নিরালা দ্বীপে
পড়ে আসে বেলা!
সাগর সাঁতার শেষে
পাখিদের মেলা।

কিংবা সুপুরি বনে
মিষ্টি বাতাস
গান গায় গুন্ গুন্–
পরিদের শ্বাস।

তারপরে ডুবে রবি
যেন কোন তীরে,
ট্রাম-বাসে ঠাঁই নেই
মানুষের ভিড়ে।

অথচ দু'চোখে তবু
দেখি নীল নীল,
কোন দূর থেকে বয়
হাওয়া ঝিল্‌মিল্।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

মেঘে রোদ্দুরে

শ্রাবণের ধারা
ঝমঝম নামে,
সূর্যি ঠাকুর
মেঘেদের খামে।

সারা দিন রাত
বৃষ্টির ধারা,
ঘুমে ঢুলুঢুলু
আমাদের পাড়া।

শুধু জেগে আছি
আমি আর টুসি
বড়দের মাঝে
দিদা, মৌটুসী।

বলে তোরা বস
চুপচাপ করে
দত্যি ও দানো
ধরে আনি ঘরে।

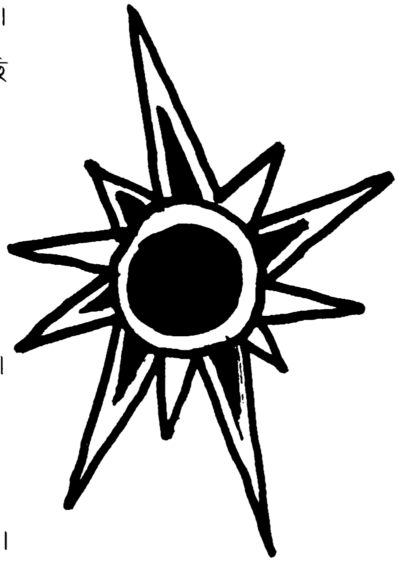
রাক্ষসও চুপ
খোক্কসও চুপ
নীল-লাল পরী
সে কি অপরূপ।

পাখা যদি থাকে
স্বাধীনতা পায়
ডানা ছেঁটে নিলে
বড় অসহায়।

আমাদেরও তাই
নীলাকাশ চাই
যাও তবে উড়ে
পাখা মেলে ভাই।

পাখা মানে ভোর
সোনা রোদ্দুর
পাখা মানে মন
বলে ছোট বোন।

স্বপ্নের রঙ
রোদ্দুর আনে
জেগে ওঠে ভোর
পাখিদের গানে।





সুখেন্দু মজুমদার

ছিল ছিল সব ছিল

মাসি ছিল পিসি ছিল
আচারের শিশি ছিল
আর দিবা নিশি ছিল
ভাব ভাব ভাব।

মামা ছিল মামি ছিল
পথে থামাথামি ছিল
সবচেয়ে দামি ছিল
মধুর স্বভাব।

দিদা ছিল দাদু ছিল
কথাতে কি জাদু ছিল
কি যে সুস্বাদু ছিল
গাছে পাকা গাব।

এলে ছিল বেলে ছিল
ডানপিটে ছেলে ছিল
তাই বুঝি চেলে ছিল
মোক্ষম চাল।

কাকা ছিল কাকি ছিল
তাই ডাকাডাকি ছিল
পড়াতেও ফাঁকি ছিল
সকাল বিকাল।

দিদি ছিল দাদা ছিল
মনটা কি সাদা ছিল
সা রে গা মা পা ধা ছিল
কেটে গেছে তাল।

গোয়েন্দা গল্প

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

চকোলেট রহস্য

রবিবার ছুটির দিন। ভোরবেলা ময়দানে ক্রিকেট প্র্যাকটিশ সেরে সবে মাত্র ঘরে এসে ঢুকেছে ডাম্বেল, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো।

ডাম্বেল রিসিভার তুলতেই শুনতে পেল ওদিক থেকে রানা কথা বলছে।

– ডাম্বেল, তুই কি এখন খুব ব্যস্ত আছিস?

– না। কেন বলতো?

– তাহলে এক্ষুনি একবার আমাদের স্কুল হোস্টেলে চলে আসতে পারবি?

– কি ব্যাপার?

– এখানে একটা দারুণ গন্ডগোল হচ্ছে। কেউই রহস্য সমাধান করতে পারছে না।

– খুন টুন কিছু? ডাম্বেল ভ্রু কুঁচকে জিগ্যেস করলো।

– না, না, ও তরফ থেকে রানা বললো, তবে রহস্যটা বেশ জটিল। এখানে এসে বুঝতে পারবি। তাছাড়া তুই তো গোয়েন্দাগিরি ব্যাপারটা পছন্দই করিস।

রানা কথাটা কিছু ভুল বলেনি। ডাম্বেলের ভাল নাম রঞ্জন দত্ত। কিন্তু ডাক নামেই সে বন্ধু মহলে বেশী পরিচিত। সে রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের এক মস্ত ফ্যান। নিজেকেও সে একজন গোয়েন্দা ভাবতেই ভালবাসে। ইতিমধ্যে গোটা কয়েক রহস্য সমাধানও করে ফেলেছে। কিন্তু বোধহয় এই প্রথম কেউ একজন কোন রহস্য সমাধানের জন্যে সরাসরি তার সাহায্য চাইলো।

ডাম্বেল রিসিভার রেখে মাকে বলে বেরুলো। তার এবারের গন্তব্যস্থল রানাদের স্কুল হোস্টেল।

রানা ডাম্বেলের সঙ্গে একটি স্কুলে পড়ে। একই ক্লাসে। ডাম্বেলের প্রিয় বন্ধু রানা। ওর বাবা মারা যাবার পর মাস খানেক হলো রানা ওদের স্কুল হোস্টেলে গিয়ে থাকছে। কিন্তু ওখানে এমন কি হলো যে এই ছুটির দিন সাত সকালে রানা তাকে ফোন করে যেতে বললো। ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত ডাম্বেলের কৌতূহল বেড়েই চললো।

ডাম্বেলের বাড়ি থেকে স্কুল হোস্টেলটা খুব বেশি দূরে নয়। আধ ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল ডাম্বেল।

স্কুল হোস্টেল কম্পাউন্ডে পা দিয়েই ডাম্বেল টের পেল এখানে একটা কিছু ঘটেছে। হোস্টেল বিল্ডিং-এর এখানে ওখানে ছাত্রদের জটলা।

ওকে দেখেই রানা এগিয়ে এল,– ডাম্বেল এসেছিস। তোর কথা সুপারিনটেনডেন্ট স্যারকে বলেছি। আমরা সবাই তোর জন্যে অপেক্ষা করছি। দোতলায় চল। আমাদের গেমটিচার এ্যান্টনি সাহেবের ঘরে।

ডাম্বেল বললো,– কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে বলবি তো?

রানা বললো,– ওপরে গেলেই জানতে পারবি।

রানার সঙ্গে ডাম্বেল দোতলায় উঠলো। লম্বা করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে হোস্টেলের গেম টিচার এ্যান্টনি স্যারের ঘর। করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে ডাম্বেল দেখলো সেই ঘরের সামনেই ছাত্রদের জটলাটা বেশি।

ডাম্বেল সেখানে পৌঁছতেই উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে একটা গুঞ্জন শোনা গেল। টাক মাথা বয়স্ক এক ভদ্রলোক ডাম্বেলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,– এস, এস ডাম্বেল। তোমার কথা রানার মুখে অনেক শুনেছি। তুমি এই বয়সেই একজন পাকা গোয়েন্দা হয়ে উঠেছো। তোমাকেই এখন আমার দরকার।

ডাম্বেল ভদ্রলোককে চেনে। উনি এই স্কুল হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ সমরেশ সিংহ। কিন্তু ওঁর নামের উপাধী সিংহ হলেও মানুষটি খুব দরদী মনের। তবে ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার ব্যাপারে দারুণ কড়া। এছাড়া রোগা ফর্সা নাক লম্বা যে ভদ্রলোক ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে দুটি ছাত্রকে এক নাগাড়ে জেরা করে চলেছেন, তাঁকেও চেনে ডাম্বেল- – উনি এ হোস্টেলের গেম টিচার মিঃ এ্যান্টনি। ডাম্বেল দেখলো এ্যান্টনি স্যারের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একাধারে রাগ এবং অসহায়তা।

ডাম্বেল জিগ্যেস করলো,– কোন কি অঘটন ঘটেছে? তাহলে তো পুলিশকে...

– না। এটা পুলিশের ব্যাপার নয় ডাম্বেল। সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ সিংহ বললেন, বলতে পার এটা এ হোস্টেলের সম্মানের প্রশ্ন। আমার হোস্টেলের কোন ছাত্র তঞ্চকতা করবে, এ আমি ভাবতে পারি না। তুমি যদি এ রহস্য সমাধান করতে পার তবে বুঝবো তোমার সম্পর্কে রানা যা বলেছে তা ঠিক– সত্যিই তুমি লিটল ডিটেকটিভ হতে পেরেছো।

– 'তঞ্চকতা' মানে তো ঠকানো? ডাম্বেল বললো, এখানে কে কাকে তঞ্চকতা করেছে স্যার?

সমরেশ সিংহ এবার যা বললেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় ঃ

দিন সাতেক আগে



স্কুল প্রেসিডেন্ট অনিল সাহা এই স্কুল হোস্টেলের ছাত্রদের অবসর বিনোদনের জন্যে একটি দারুন ভিডিও গেম উপহার দিয়েছিলেন। তাতে নানা মজার মজার খেলা আছে। ফুটবল, ক্রিকেট, দাবা থেকে শুরু করে কার রেসিং এমনকি পাখি শিকার পর্যন্ত হরেক মজার খেলা।

গত সাতদিন যাবৎ হোস্টেলের ছাত্ররা এই ভিডিও গেম নিয়ে একেবারে মেতে থেকেছে। সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ সিংহ দেখেছেন এই সাতদিনে ওই ভিডিও গেমের নেশায় হোস্টেলের ছাত্রদের পড়াশুনার বিস্তর ক্ষতি হয়েছে– এমনকি বিকেলবেলা হোস্টেলের মাঠে খেলতে পর্যন্ত যেতে চাইছে না। ছেলেরা। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ জিনিস তিনি হোস্টেলে রাখবেন না। তার বদলে গরমের ছুটির আগে এটি কোন একজন ছাত্রকে দিয়ে দেবেন। সে ছুটিতে তার বাড়িতে এই ভিডিও গেম নিয়ে গিয়ে যত খুশি খেলা দেখবে। তারপর ছুটির শেষে হোস্টেলে ফিরে আবার পড়াশুনায় মন দেবে। এতে তার কিংবা হোস্টেলের অন্য কোন ছাত্রের পড়াশোনার কোন ক্ষতি হবে না।

উনি অবশ্য জিনিসটা লটারী করে কাউকে দিতে পারতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে গেমসটিচার মিঃ এ্যান্টনি একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন লটারীর বদলে একটা মজার প্রতিযোগিতা হোক। তাতে যে জিতবে, সেই পাবে এই দারুণ ভিডিও গেমটা।

প্রতিযোগিতা হলো এইরকম ঃ

গেম টিচার মিঃ এ্যান্টনি একটা জারের মধ্যে কিছু চকোলেট রাখবেন। কতগুলো চকোলেট অন্য কেউ জানবে না। তারপর প্রতিযোগিতার দিন সকালে হোস্টেলের একতলার হল ঘরে টেবিলের ওপর জারটা রেখে ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া হবে এর মধ্যে কটি চকোলেট আছে? যার অনুমান সঠিক অথবা সঠিকের একেবারে কাছাকাছি হবে, সেই ছাত্র পুরস্কার হিসেবে পাবে ওই ভিডিও গেম। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পাবে জারের সবকটি চকোলেট।

– প্রতিযোগিতা হয়েছিল? ডাম্বেল প্রশ্ন করেছে।

– হ্যাঁ। গেমস টিচার মিঃ এ্যান্টনি এবার বললেন, প্রতিযোগিতা হয়েছিল দুদিন। গতকাল প্রথমদিনের প্রতিযোগিতায় হোস্টেলের দুজন ছাত্র জারের মধ্যে চকোলেটের সংখ্যা সর্বাধিক একই বলায় শুধু ওই দুজনকে নিয়ে আজকের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল।

– একটু দাঁড়ান, এখানটায় মিঃ এ্যান্টনিকে বাধা দিয়ে ডাম্বেল বললো, সর্বাধিক একই সংখ্যা অর্থে আপনি কি বলতে চাইছেন।

– মানে ইন্দ্রনীল রায় এবং রজত হাজরা দুজনেই বলেছে জারের মধ্যে চকোলেটের সংখ্যা পঁচাত্তর। আসলে ছিল আশিটি চকোলেট। হোস্টেলের অন্য ছাত্ররা আসল সংখ্যার এত কাছাকাছি পৌঁছতে পারে নি।

– তারপর?

– তারপর আজ দ্বিতীয় দফায় ওই দুজনকে ডেকে আবার প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল।

– ফলাফল কি হলো?

– ফলাফল বলতে ইন্দ্রনীল বলেছে একশোটি চকোলেট আর রাজেশ বলেছে পঁচানব্বই। চকোলেটের সংখ্যা ছিল একশো একটি।

– তাহলে তো ইন্দ্রনীলই জিতেছে। ভিডিও গেমটা ওরই পুরস্কার হিসেবে পাওনা উচিত। ডাম্বেল বললো।

– হ্যাঁ, সেটাই হওয়া উচিত, কিন্তু সমস্যার জটও সেখানেই পাকিয়েছে, এবার বললেন সুপারিনটেনডেন্ট স্যার।

– কি সমস্যা স্যার?

– সমস্যা হলো গেমস টিচারের ঘরে যখন বিজয়ী ইন্দ্রনীল আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রজতকে ডাকা হলো, রজত এই প্রতিযোগিতার ফল মানতে রাজি হলো না। ওর ধারণা ইন্দ্রনীল অসাধুতা করে এ প্রতিযোগিতায় জিতেছে।

– অসাধুতা। তার মানে?

– তার মানে রজতের ধারণা ইন্দ্রনীল প্রতিযোগিতার আগেই এ ঘরে ঢুকে জারের মধ্যে কটা চকোলেট আছে তা গুনে গেছে।

– তা কি করে সম্ভব? এ্যান্টনি স্যার নিশ্চয়ই ইন্দ্রনীলকে এ সুযোগ দেননি।

– প্রশ্নই ওঠে না, মিঃ এ্যান্টনি বললেন, গত রাতে আমি নিজে ঘরের ওই উঁচু তাকে জারের মধ্যে চকোলেট রেখে ঘর তালা বন্ধ করে গেছি। চাবিও আমার কাছেই ছিল। আমি কাউকে জানাই নি।

– আমি তো বলছি না এ্যান্টনি স্যার কাউকে জানিয়েছেন। ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি এতক্ষণ একনাগাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করছিল, এবার সে এগিয়ে এল। দৃঢ় কণ্ঠে বললো,-
– আমি নিশ্চিত, গত রাতে স্যার এ ঘরে চকোলেট রেখে ঘরের দরজা বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যাবার পর ইন্দ্রনীল চুপি চুপি এঘরে ঢুকেছিল। তারপর জারের ভেতরের চকোলেটের সংখ্যা গুণে জার আবার যথাস্থানে রেখে চলে গেছে।

ও যখন এসব কথাগুলো বলছিল ডাম্বেল ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ছেলেটির একমাথা রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল, জামা প্যান্ট অবিন্যস্ত। সারা মুখ উত্তেজনায় গনগন করছে। ডাম্বেল বললো,– তোমারই নাম রজত হাজরা?

– হ্যাঁ।

– তুমি যা বললে তার কোন প্রমাণ আছে? গেমস টিচার যদি নিজে তাঁর ঘরে চাবি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে তিনি সে চাবি কাউকে না দিলে অন্য কেউ ঘরে ঢুকবে কি করে?

– ওই জানলা দিয়ে।

রজতের কথায় ডাম্বেল এবার ফিরে তাকাল। ঘরের তিনদিকে তিনটে বড় বড় খোলা জানলা। জানলাগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো কোন জানলাতেই গরাদ নেই।

রজত বললো,– দেখতে পাচ্ছ ওদিকের খোলা জানলার ফ্রেমের ওপর একটা সিঁড়ি উঁকি দিচ্ছে। আমার ধারণা ওই সিঁড়ি বেয়েই ইন্দ্রনীল গত রাতে এ ঘরে ঢুকেছিল। তারপর ওই উঁচু র‍্যাক থেকে পোর্সোলিনের জারটা নামিয়ে চকোলেটগুলো গুণে আবার সেই জার ঠিক জায়গায় রেখে গেছে। এর প্রমাণও দেখাতে পারি।

– কি প্রমাণ?

– এই দেখ ডাম্বেল, র‍্যাকটার নিচে একটা ছোট টুল বসান রয়েছে। এর কারণ কি বলতো?

– কি? ডাম্বেল জিগ্যেস করলো।

– কারণ আর কিছু নয়, বেঁটে ইন্দ্রনীল ওই র‍্যাকের ওপর জারে হাত পায়নি, তাই ঘরের ওদিক থেকে এই টুলটা এনে র‍্যাকের নিচে রেখে তাতে পা দিয়ে উঠে জার নামিয়েছে। তারপর কাজ সেরে ফিরে যাবার আগে টুলটা সরিয়ে রাখতে ভুলে গেছে।

ডাম্বেল এবার ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। ওর ছোটখাট চেহারা। হাইট চার ফুট দশ ইঞ্চির বেশি হবে না। ঘরের দরজার পাশে সে এতক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিল। ডাম্বেল

তার কাছে গিয়ে বললো,– ইন্দ্রনীল, তুমি কিছু বলবে না।

ইন্দ্রনীল মাথা তুললো। বললো,– আমি তো বহুবার আমার কথা বলেছি। প্রতিযোগিতায় জেতবার জন্যে ওসব নোংরা কাজ আমি করি না। ভিডিও গেমস্ আমার চাই না। প্লিজ, এভাবে তোমরা আমায় অপমান কোর না। মনে হলো দুঃখ আর অপমানে তার মুখটা থম থম করছে।

ডাম্বেল ইন্দ্রনীলকে আর কিছু না বলে এবার সেই জানলাটার কাছে গেল। দোতলার গরাদহীন জানলাটার ওপর ঠেসান দেওয়া রয়েছে একটা বাঁশের সিঁড়ি। ডাম্বেল জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো ওটা হোস্টেলের পেছন দিক, নিচে বাগান।

ডাম্বেল সুপারিনটেনডেন্ট স্যারকে জিগ্যেস করলো, ওই সিঁড়িটা নিশ্চয়ই হোস্টেলের?

– হ্যাঁ। ওটা বাগানের এক ধারেই শোয়ান থাকে।

ডাম্বেল এবার ঘরের ভেতরটায় ভাল ভাবে চোখ বুলোতে লাগলো। মনে মনে ভাবলো এ পরিস্থিতিতে তার গুরু রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ কি করতেন? ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়লো– মই লাগান জানলাটার নিচে আর চকোলেট জার রাখা র্যাকটার নিচে কয়েক জায়গায় শুকনো কাদা মাটি জমাট বেঁধে রয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করে মনে হলো এ কাদা এসেছে জুতোর সঙ্গে। কারণ কাদার মধ্যে জুতোর সোলের দাগ রয়েছে।

ডাম্বেল কয়েক মুহূর্ত পুরো ব্যাপারটা মনে মনে ভেবে নিল, তারপর গেমস টিচার এ্যান্টনি স্যারকে বললো,– আচ্ছা স্যার, একটু মনে করে বলুন তো, গতকাল সন্ধেবেলা শেষবার যখন এঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তখন ঘরের জানলা এবং দরজায় ঠিকমতো তালা গালিয়েছিলেন তো?

– হ্যাঁ মনে আছে। দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়েছিলাম আর জানলাগুলো ভেতর থেকে বন্ধ করেছিলাম।

– জানলাগুলোতে ছিটকিনি লাগিয়েছিলেন!

– ছিটকিনি? না। এ্যান্টনি স্যার বললেন, জানলায় ছিটকিনি কোনদিনই লাগান হয় না। এমনিই ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়। এমন কিছু দামি জিনিস তো দোতলার এঘরে থাকে না।

– হুঁ। ডাম্বেল মনে মনে হিসেব কষে, তার মানে এ ঘরে জানলা বাইরে থেকে খোলা সম্ভব। এরপর ডাম্বেল গেমস টিচারকে জিগ্যেস করলো,– আচ্ছা স্যার, আজ সকালে ঘরের জানলাগুলো কে খুলেছে?

– আমিই খুলেছি। মিঃ এ্যান্টনি বললেন, সকালবেলা প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে চাবি খুলে ঘরে ঢুকে জানলাগুলো খুলেছি। তারপর চকোলেটের জারটা নামিয়ে নিয়ে গেছি।

– আচ্ছা। তখন কি মইটা ওই জানলার বাইরে আর এই টুলটা র্যাকের নিচে দেখেছেন?

– না ডাম্বেল, ব্যস্ততার মধ্যে ওসব তখন খেয়াল করিনি। একটু ভেবে মিঃ এ্যান্টনি বললেন।

ডাম্বেলের কাছে এতক্ষনে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এবার সে এ্যান্টনি স্যারকে জিগ্যেস করলো,– আচ্ছা স্যার, আজকের প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগে কি অন্য কোন অনুষ্ঠান ছিল?

– সকলেই স্কুল ইউনিফর্ম পরে রয়েছে বলে ভাবল বুঝি, এ্যান্টনি স্যার হেসে বললেন, হ্যাঁ, আজ রবিবার ছুটির দিন হলেও মরনিং প্যারেডটা যথারীতি হয়েছে। তারপর শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা পর্ব।

– হুঁ, তাই সকলেই পায়ে কেড্স পরে রয়েছে... কিন্তু রজত, তোমার পায়ে কালো বুট জুতো কেন? তুমি কি আজ বুট জুতো পরেই মরনিং প্যারেডে গিয়েছিলে?

– তা হতেই পারে না, রজত কিছু বলার আগেই এ্যান্টনি স্যার বললেন, আমি প্রতিদিন নিজে মরনিং প্যারেডের আগে প্রতিটি ছাত্রের পোষাক পরীক্ষা করি। তখন রজতের পায়েও কেডস জুতোই ছিল।

– না... মানে... নতুন কেনা কেডস জোড়া পায়ে একটু টাইট লাগছিল, তাই প্যারেডের পরে...

– মিথ্যে কথা। এবার পাকা ডিটেকটিভের মতোই ডাম্বেল দু পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বললো,– আমি যদি বলি কেডস জুতোর কাদা লুকোতেই তুমি ওটা ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছ!

– কি বলছ তুমি ডাম্বেল, রজত আমতা আমতা করে।

– ঠিক বলছি, ডাম্বেল বললো, আসলে যা ঘটেছে তা হলো প্রতিযোগিতার ফলাফল জানার পরই তোমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধিটা খেলে যায়। সেই মতো গেমস টিচার ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রথমে দৌড়ে গিয়ে বাগানে ঢুকেছিলে তারপর বাগানের এক কোণ থেকে বাঁশের সিঁড়িটা জানলা পর্যন্ত তুলে সিঁড়ি বেয়ে তুমি নিজেই ঘরে এসে ঢুকেছিলে এবং ছোট টুলটা র্যাকের নিচে রেখে ঘর থেকে দরজা পথে বেরিয়ে গিয়েছিলে। এ কাজ করতে গিয়ে বাগানের কাদাই তোমার কেডস জুতোয় লাগে, যার দাগ এই ঘরের মেঝেতে এখনও রয়েছে– আর সে প্রমাণ ঢাকতেই তুমি চটপট পায়ের কেডস ছেড়ে কালো বুট জুতো পরে এসেছ। বলতে বলতে ডাম্বেল ঘরের মেঝেতে কেডস-এর কাদার ছাপ দেখাল।

রজত এবার মরিয়া হয়ে বললো,– তুমি যা বললে ঠিক সেই ভাবে ইন্দ্রনীলও কাজটা গত রাতে করতে পারে। বাগান থেকে সিঁড়ি বেয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে তারপর র্যাক থেকে জার নামিয়ে চকোলেটের সংখ্যা জেনে আবার জানলা পথেই নেমে গেছে। আর কেডস জুতোর কাদা ও তুলে ফেলেছে।

– হ্যাঁ, এটা সম্ভব ছিল, যদি ঘরের জানলা গত রাতে বন্ধ না থেকে খোলা থাকতো, বলতে বলতে ডাম্বেল সুপারিনটেনডেন্ট স্যারের দিকে তাকিয়ে বললো,– স্যার, আপনিই বলুন, দোতলার বন্ধ জানলার ফ্রেমের ওপর ওভাবে সিঁড়ি রেখে কারুর পক্ষে কি বাইরে থেকে জানলা খোলা সম্ভব?

– না। সম্ভব নয়। ঠিক বলেছ ডাম্বেল। এটা আমাদের কারুর মাথায় আসেনি। এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আর ঠিক তক্ষুণি রানা ঘরে ঢুকলো। ওর হাতে এক জোড়া কাদামাখা কেডস জুতো। রানা বললো,– স্যার রজতের এই কেডস্ জোড়া ওর ঘরে খাটের নিচে কাগজে মোড়া অবস্থায় ছিল।

একেবারে হাতে নাতে অকাট্য প্রমাণ। রজত এবার আর কোন কথা বলতে পারলো না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর সব চালাকি ফাঁস করে দিয়েছে ডাম্বেল।

সবাই ওকে ধিক্কার দিয়ে উঠলো।

সেদিন সুপারিনটেনডেন্ট স্যার প্রতিযোগিতার পুরস্কারটি তুলে দিলেন বিজয়ী ইন্দ্রনীলের হাতে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থানাধিকারী রজত হাজরার প্রাপ্য একশো একটা চকোলেট থেকে তাকে ইতিমধ্যেই বঞ্চিত করা হয়েছিল তার দুষ্কর্মের শাস্তি স্বরূপ।

সেই একশো একটি চকোলেটের জারটি উপহার দেওয়া হলো লিটল ডিটেকটিভ ডাম্বেল দত্তকে। ডাম্বেল সে উপহার গ্রহণ করে জারের সব চকোলেট বিলি করে দিল হোস্টেলের বন্ধুদের মধ্যে।

সবাই হাততালি দিয়ে ডাম্বেলকে অভিনন্দন জানাল।

সৈয়দ রেজাউল করিম

সেই রাতে

রাত তখন এগারোটা। শীতের হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি। দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে আমেদাবাদ এক্সপ্রেস। ফার্স্ট ক্লাসের কূপের মধ্যে আমরা দুজন যাত্রী। আমি উঠেছি ভুসাবল স্টেশন থেকে। লোকটা কোথা থেকে উঠছে কে জানে? তার মুখটা পর্যন্ত দেখার সৌভাগ্য তখনও হয়ে ওঠেনি।

আমি তখন বুঁদ হয়ে আছি অন্য নেশায়। মাথার ধারে জ্বলছে রিডিং ল্যাম্প। হাতে 'নিশিথ রাতের আগন্তুক'। এক দুর্বার আকর্ষণে আমি তখন ছুটে চলেছি। মনের মধ্যে একটা ভৌতিক শিহরন। অজানা আশঙ্কায় দুলছে তখন হৃদয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন তখন নিরর্থক।

বেহায়া, বেআক্কেলের মত হঠাৎ আলোটা গেল চলে। বিরক্তিতে মনটা ভরে ওঠে। সরকারী ব্যাপার তো! পয়সা নেবার বেলায় ষোলআনা, স্বাচ্ছন্দ্যের বেলায় কানাকড়ি। মনে মনে গাল পাড়ি।

ট্রেন তখন আরও জোরে ছুটছে। তার কু-ঝিক-ঝিক আওয়াজ, মাঝে মাঝে হুইসেলের শব্দ কাঁচের শার্শি ভেদ করে কানে এসে ঠেকছে। বাইরের আলো মাঝে মধ্যে উঁকি মেরে দেখছে আমাদের। আবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে কূপটা।

সেই আলো আঁধারিতে দেখলাম কম্বল সরিয়ে লোকটা উঠে দাঁড়াল। বয়স মনে হল চল্লিশের কোঠায়। পরনে লুঙ্গি। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি জাতীয় কিছু একটা। তাতে ছোপ ছোপ রঙের ছাপ।

আমি যে ঘুমাইনি সেটা জানান দিতে খক্ খক্ করে দুবার কাশলাম। লোকটা সেদিকে কোন তোয়াক্কা করল না। নিচের সিটে পা দিয়ে লম্বা হয়ে এ্যালার্মের চেন ধরে টান দিল। আমি সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করলাম।

– 'এ কি করলেন আপনি?'

লোকটা বলল– 'সামনে বিপদ'।

গলার স্বরটা কেমন বেমানান। বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক। লোকটার ব্যাপার দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম– ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল বোধ হয়। না হলে 'সামনে বিপদ' এ ধরনের ধারণা মনে হয় কি করে? কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই লোকটা বলল-

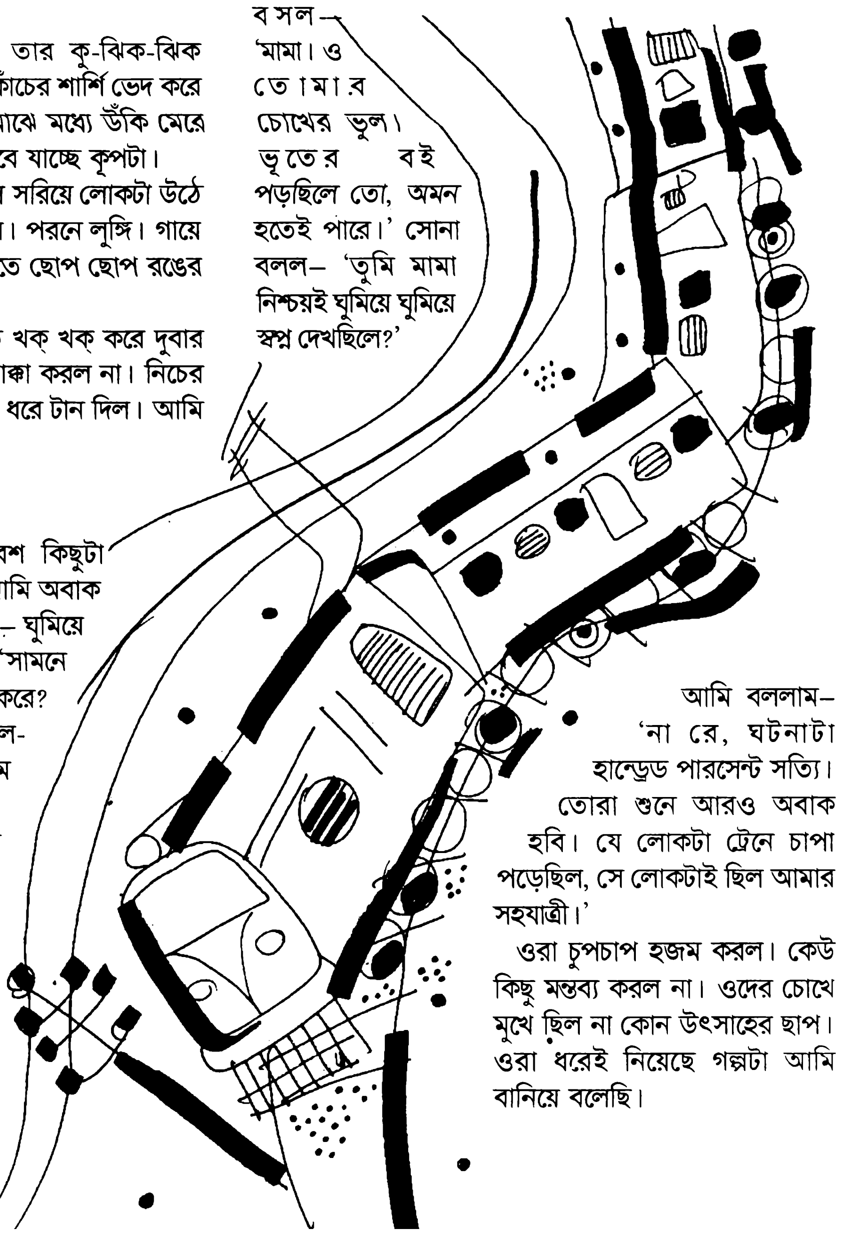
– 'দেশলাই আছে? না বলতে পারলাম না। পকেট হাতড়ে দেশলাইটা দিলাম।'

ফস করে একটা শব্দ হল। আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল কূপটা। লোকটা তার দু হাতের মাঝে আগুনটা নিয়ে সিগারেট ধরালো। সেই সাথে আমার চোখ দুটো আছড়ে পড়ল লোকটার মুখে। আর ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত আমি ঠিকরে পড়লাম। উপরের বাঙ্ক থেকে একেবারে নিচে। তড়িঘড়ি করে লোকটা চলে গেল বাইরে। কাঠিটা নিভে যেতেই অন্ধকারে ভরে গেল কূপটা।

কিন্তু তখনও লোকটার মুখ ভাসছে আমার চোখের তারায়। মুখ তো নয় যেন মাথার খুলি। শুধু হাড় আর হাড়। মাংসের লেস মাত্র নেই ঠিক যেন বই-এর পাতায় আঁকা ভূতের ছবির মত। সভয়ে দু হাতে চোখ মুখ ঢেকে ভুলতে চাইলাম সে মুখ। কিন্তু পারলাম না।

ট্রেনটা তখন থেমে গেছে। অকলা স্টেশনের একটু আগে। উৎসুক মানুষেরা কামরা ছেড়ে বার হয়ে জানতে চাইছে কি হয়েছে? খবর পাওয়া গেল একটা মানুষ রেল লাইনে কাটা পড়েছে।

পল্টু, সোনা, মিতা সবাই চোখ পাকিয়ে তাকাল আমার দিকে। ভাবখানা যেন আমি মিথ্যে বলছি। সুমিতা বলেই বসল– 'মামা। ও তোমার চোখের ভুল। ভূতের বই পড়ছিলে তো, অমন হতেই পারে।' সোনা বলল– 'তুমি মামা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলে?'



আমি বললাম– 'না রে, ঘটনাটা হান্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি। তোরা শুনে আরও অবাক হবি। যে লোকটা ট্রেনে চাপা পড়েছিল, সে লোকটাই ছিল আমার সহযাত্রী।'

ওরা চুপচাপ হজম করল। কেউ কিছু মন্তব্য করল না। ওদের চোখে মুখে ছিল না কোন উৎসাহের ছাপ। ওরা ধরেই নিয়েছে গল্পটা আমি বানিয়ে বলেছি।

অসীম সরকার

ঋক্ষরাজের বৃক্ষবাস

জায়গাটা অনেকটা হাতির পিঠের মত উঁচু– একে বলে ট্যাক– জোয়ারের জল যখন কুল কুল করে নদী-নালা-খানা-খন্দে ঢুকে যায় তখনও এ জায়গাটুকু ডোবে না। খুব বড় গাছ এখানটায় না থাকলেও মাঝারি গাছ অনেক আছে।

– তা ছাড়াও– নাম-না-জানা হাজার গাছের ঝোপ, বড় বড় ঘাসে মাটি দেখা যায় না। জায়গাটা, চওড়ায় হাত পঞ্চাশেক আর লম্বায় একটু বেশিই হবে। ওই, সোত্তর পঁচাত্তর হাত মত হবে। তিনদিকে খাল আর উত্তরে ঠিক খাল নয়, ওই নাবাল জমি আর কি।

ডান দিকের একটা ঝোপ নড়ে উঠলো একটু, সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিকে ঝোপটাও। না, হাওয়া নয়। এখানে অমন হাওয়া তো সবসময়েই বয়ে যায়, তবে তার রকম আলাদা– হয়ত ডালপালা উত্তর দিকে হেলে পড়লো কিংবা পুব দিকে। বেশিরভাগই এমনি ধারা। এক সাইক্লোন হলে আলাদা কথা। তখন পুব পশ্চিম অত হিসেব নিকেষ থাকে না। কিন্তু তারও রকম আলাদা, এমন থির থির করে কাঁপা কি নড়ে চড়ে ওঠা নয়। বাব্‌রিচুলো ডাকাত তার ভিজে মাথাটা যেমন হাত তলোয়ার দিয়ে মানে আঙ্গুলগুলো সোজা করে সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঝাপট মেরে মেরে জল ঝাড়ে, ঝোপগুলোর অবস্থা অমনি হয়। হলটা কি?
এবার বোঝা গেল।

ডানদিক থেকে হলদের ওপর কালো ডোরাকাটা একটা মস্ত চেহারা ঝোপ ছেড়ে একটু ফাঁকা ঘাস জমির ওপর বেরিয়ে এলো, বললে– ঘ্র্যাও– ঘাঁউ-উঁ-ম্। গাছপালা নিয়ে পুরো জঙ্গলটা যেন কেঁপে উঠলো। শব্দ কটার মানে হল– এখানে আমিই রাজা , তুই আবার কেরে? তখন ওদিক থেকে বেরোলেন আরও একজন, ওরে বাবা এযে আরও বড় আরও ভারিখ্‌খে মিশ কালো চেহারা। বললে–- ঘোঁরর ফোঁওৎ ফোঁৎ। জঙ্গল কাঁপলো না, কিন্তু বাঘের গোঁফগুলো একটু চমকে গেল। যাবেই। কারণ এঁর কথাটার মানে হল– হ্যাঃ ইয়ারকি মারিস্‌না, চুপ কর, চুপ কর।

তা ভাই ওঁদের কথাতো খানিকক্ষণ চলবেই, কতো আর মানে বলে বলে দেবো? তার চেয়ে সোজা বাংলাতেই বলি– ওই হল – তারমানে লিখি। বলতে তো ঢের মজা, তোমাদের মুখগুলোও দেখতে পেতুম, নগদ দাম উশুল হয়ে যেতো গল্পের, তা তো আর হবার নয়, তাই লিখি। ডানদিকের যিনি, তিনি যে বাঘমশায় তাতো বুঝেছো, সাক্ষাৎ সোঁদর বনের বাঘ– আরে জায়গাটা তো সোঁদর বনই। বাঁ দিকের যিনি তিনি ভালুক মশায় কিন্তু বিরাট চেহারা। বাপরে– কোথাকার কে জানে। এখানে তো আগে কোনওদিন দেখিনি এমনটি। তবে ভেবোনা, সে নিশ্চয়ই পরে বোঝা যাবে।

বাঘের খুব রাগ হল, মনে হল– এক থাবা মেরে মুন্ডুটা ছিঁড়ে অন্ততঃ ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু না আগে একটু জরিপ করা দরকার। দাঁড়ালে আটফুটের ওপর হবে, ওজনও বিপুল, ওর মতো লাফাতে হয়তো পারবে না, কিন্তু বাঘ তার অনুভূতি দিয়ে বুঝলে– এর ফুটওয়ার্ক দুর্দান্ত, এ সৌরভ গাঙ্গুলি নয় যে মিড অফ দিয়ে ড্রাইভ মারারা স্ট্যান্স নিয়ে লংলেগের ওপর দিয়ে পুল শট মারতে যাবে। কথাটা মনে হতেই বাঘের মনটা খারাপ হয়ে গেল, ছেলেটা যদি বাঁপাটা অফস্টাম্পের দিকে কোনাকুনি ইঞ্চি ছয়েক এগিয়ে, ডানপায়ে মাটির ওপর অদৃশ্য বৃত্তচাপ এঁকে, বলে চোখ রেখে পুল করতো, তাহলে প্রত্যেকটাই ছক্কা হত (ছেলেটার হাতের জোর তো কম নয়) ব্যাটের হাতলের কাছাকাছি জায়গায় গেলে 'উল্টোগালিতে' অক্কা হত না। মানে, বাঘ হলেও বাঙালিতো, দুঃখ তো হবেই। সে যাক, এখন একে কি করা যায়? এমনিতে তো কেলেভুষুণ্ডী, তার ওপর সাদা উল



দিয়ে বুকে বিরাট করে ''ভি ফর ভিকট্রি'' বুনিয়ে নিয়েছে। কোন খেলায় জিতেছো বাছা!

ভালুক 'ঘড়াৎ', 'ঘড়াৎ' করে খানিকটা হেসে বললে– তুই একটা বুদ্ধু, আমার বুকের 'ভি' টা আমি উল দিয়ে বোনাতে যাবো কেন? তুই কি তোর কালো ডোরাগুলো কাউকে দিয়ে বুনিয়েছিস? – এসব প্রকৃতির ব্যাপার। আর ফুটওয়ার্কের কথা– হ্যাঁ আমাকে যতই ঢল্‌ঢলে থল্‌থলে লাগুক না কেন, ফুটওয়ার্কটা আমার বরাবরই দারুণ। তুই আমার ওপর ঝাঁপ দিলে– চোখের পলক ফেলবার আগে যে কোন পায়ের ওপর পাঁই করে ঘুরে তোর পিঠে নোখ দিয়ে লাল লাল ছবি এঁকে দেবো, শিরদাঁড়াটাও ছল ছলে করে দিতে পারি– ওসব চিন্তাও মনে ঠাঁই দিসনি। আর তুই যদি ব্যাটিংটা সৌরভের চেয়ে ভালই বুঝতিস তাহলে ডালমিয়াজী তো তোকেই ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন করে দিতেন– হাজার হোক তুইওতো বাঙালি। বাঘ গরগর করে বললে, আমি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, জানো তুমি?

–হ্যাঁ ওটাতো বয়কট সাহেব সৌরভকে বলে, তোকে নয়। বলবেই বা কেন? তুই হলি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ছোট সাইজের ডোরাকাটা বাঘ। তোদের কাদামাটির ওপর দিয়ে চলবার জন্যে, প্রকৃতিই একটু হালকা করে গড়েছেন– ওই ধর, আড়াই থেকে তিন সাড়ে তিন কুইন্টাল– হোঃ হোঃ আমার ওজন জানিস? পাক্কা সাত কুইন্টাল। দ্যাখ, সবচেয়ে বড় সাইজের বাঘ হচ্ছে সাইবেরিয়ার। ওদেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয় হচ্ছে কুমায়ন গাড়োয়ালের বাঘেরা। তা ওই যে জিম করবেট সাহেব, তিনি সবচেয়ে বড় যে বাঘটা মেরেছিলেন– ওই যে রে পাওয়লগড়ের কুঁয়ার সাব, সে কত লম্বা ছিল জানিস? নাক থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত দশফুট সাত ইঞ্চি– তাও ওভার কার্ভস। তার মানে 'বিটুইন পেগস' অর্থাৎ নাকের লাগোয়া একটা আর টান টান করে ল্যাজের শেষে একটা খোঁটা পুঁতে বাঘটা সরিয়ে ওই ফাঁক টুকুর মাপ নিশ্চয়ই দশফুট মতো। এবার সাড়ে তিন ফুট ল্যাজ বাদ দে তার থেকে, তাহলে দাঁড়ালো সাড়ে ছ'ফুট। আর আমার ল্যাজের অবস্থা তো দেখছিস– আছেও, আবার নেইও, তাও নাকের ডগা থেকে পেছনের পা পর্যন্ত আটফুট, বুঝলি?

তবে একটা কথা আছে, তোরা দেখতে ছোট হলেও রঙের জেল্লায় আর ডোরা দাগে, অন্যদের টেক্কা দিয়েছিস। সাঁতারেও ওস্তাদ আছিস।

– তা তুমি এলে কোথা থেকে, তুমিতো এখানকার নও?

– আমাকে গাড়োয়ালী , কুমায়ুনী কিংবা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের লোক বলতে পারিস– আমরা মানুষের মত অত ভূগোলের ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করিনে।

– সে তো অনেকদূর, অনেকপথ, তুমি এলে কি করে, এখানে?

– সে এক লম্বা কাহিনী রে। একটু দুঃখের সুরে ভালুক বললে, পালাতে পালাতে এখানে চলে এসেছি শেষ পর্যন্ত।

– কার কাছ থেকে পালাচ্ছিলে? বাঘ একবার হিমালয়ের ভাল্লুকের বিরাট চেহারাটার দিকে চেয়ে দেখলে। মনে মনে ভাবলে, – বাব্বা এর চেয়েও পেল্লায় জিনিষ আছে তাহলে! কি বাবা, ইয়েতি টিয়েতি নাকি?

ভালুক বললে– আরে তা নয় তা নয়, তুই যা ভাবছিস সে সব নয়। পালাতে হল দুটো ছোঁড়ার জন্যে।

– ছোঁড়া! মানে, মানুষের ছেলে?

– ওরে হ্যাঁরে, মানুষের ছেলে। ছেলেগুলো মোটেই সাধারণ নয়, অসাধারণ মাথা সব। একটা সিমলের গৌতম দত্ত, অন্যটা ওর পিসির ছেলে– অমিতাভ কোষ্টার।

– সিমলেতে আবার কোষ্টার কেউ আছে নাকি, ও আবার কি টাইটেল?

– আরে সিমলের হতে যাবে কেন! গৌতমের পিসি রাজলক্ষ্মী এক জার্মান বিজ্ঞানীকে– ওই ফ্রিডরিশ কোষ্টারকে বে করলো না? ওদেরই ছেলে অমিতাভ কোষ্টার। ওই ছোঁড়াটাই বেশি শয়তান– পিছন থেকে এমন ঘুমপাড়ানো-গুলি মারলে...

– তুমি ওদের দেখতে পাওনি?

– আরে, দেখবো কিরে, আমি তখন মনের আনন্দে পাকা স্ট্রবেরী খাচ্ছি, আমার তখন হুঁশ ছিল কি? গুলি খেয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি দুটো ছোঁড়া বিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে, ফর্সাটার হাতে বন্দুক সেটা মাটির দিকে নামানো। ব্যাস, ওই শেষ দেখা। পড়লুম 'দমাস্' করে, আবছা শুনতে পেলুম একজন বললে– ''ব্যাস নিশ্চিন্দি, ও এখন বারো ঘন্টা ঘুমোবে''। আর কিছু দেখিওনি শুনিওনি।

– তারপর?

– তারপর যখন একটু জ্ঞান হয়েছে, দেখি সামনের পায়ে একটা মোটা চামড়ার পট্টি তার সঙ্গে চেন লাগানো, আছি একটা তাঁবুর মধ্যে জালের খাঁচায়। মাথাটা চিন চিন করছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে সব পরিস্কার হয়ে গেল। বুঝলুম কানের একটু ওপরে ছোট্ট অপারেশন করে ওরা একটা মাইক্রো-কমপিউটার ঢুকিয়েছে। তার সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের যোগাযোগ ঘটিয়ে...

– জ্বালালে দেখছি, কমপিউটার– মস্তিষ্ক, এ সমস্ত কি?

– আরে বুদ্ধু কমপিউটার না হয় না জানলি, মস্তিষ্ক তো বুঝবি? ব্রেন, মগজ, ঘিলু এ সব বুঝিস তো? হরিণ মেরে মাথাটা ভেঙ্গে চুষে খাসনি?

– হ্যাঁ খেয়েছি একটু ঘি ঘি মতন।

– ব্যাস, ওটাই মগজ, চিন্তা করার সব শক্তি ওখানে। শরীরের ওজনের অনুপাতে যে প্রাণীর মগজের ওজন যত বেশি সে ততো বুদ্ধিমান।

– বাপরে, বড় কঠিন কথা সব, যাক্‌গে তারপর কি হল সেটাই বলো।

– উঁহু একটু বুঝতে হয়, অত গেঁয়ো থাকতে নেই, বুঝলি? মানুষ হচ্ছে সব চেয়ে বুদ্ধিমান তারপর ডলফিন তারপর...

– তারপর তুমি। নাও তারপর কি হল সেটাই বলো।

– নারে অত সোজা নয়। আমার মাথা যে এরকম কাজ করছে সমস্ত ওই মাইক্রো কমপিউটারটা থাকার জন্যে। এই যে, তুই যা ভাবছিস বলার আগেই আমি সব বুঝে নিচ্ছি সেটা কি করে? তোর চোখ মুখের ভাব, নড়াচড়া বিশ্লেষণ করে কমপিউটার আমাকে বলে দিচ্ছে, তাই। তা নইলে আমি অনেক পরে আছি। আমার আগে হাতি আছে, শিম্পাঞ্জী আছে– এ হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যাপার, অনেক পরীক্ষা না করে বলা যায় না কার পরে কে। যাকগে তুই যখন শুনতে চাস না তখন না হয় থাক।

– সেই ভালো। তুমি জ্ঞান হয়ে দেখলে পায়ে পট্টি বাঁধা। তারপর বলো।

– হ্যাঁ তাই বলি। ওরা একটা ভুল করেছিল, বুঝলি। ওরা

আমার ওজন, আরণ্যক শক্তি, পাহাড়ের উঁচু নিচু জায়গায় অত ওঠা নামা– এগুলো ঠিক হিসেবে ধরেনি, তাই 'ডোজটা' ঠিক করতে পারেনি। ওদের হিসেবের অনেক আগেই আমি জেগে উঠেছি, অপারেশন টপারেশন সেরে ওরা তখন একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। বিকেল ছটায় গুলি খেয়েছি। ওরা ভাবলে আমি ফের জাগবো ভোর ছ'টায়। তার বদলে আমার ঘুম ভাঙ্গলো রাত একটায়। এক ঝটকায় লোহার শেকল ছিঁড়ে ফেললুম, খাঁচাটা ভাঙলো 'মড় মড় মড়াৎ' করে। তাঁবুটাও হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো। ওরাও জেগে উঠলো, কিন্তু জাগলে কি হবে? মিশ কালো রাত্রির অন্ধকারে কালো ভালুককে আর খুঁজে পায়? ওদের সার্চ লাইটের আলোয় ওরা ঝোপ ঝাড়, গাছপালাই দেখলে, আমায় নয়।

– তারপর তুমি কি করলে?

– আমি? আমার মাথার মধ্যে কে যেন বললে– 'মাগঙ্গার দিকে ছোটো' আমিও ছুট লাগালুম, জলের গন্ধ পাচ্ছিলুম, আধঘন্টা মত ছোটার পর শব্দও পেলুম। আমাদের ওখানকার মা গঙ্গাতো তোদের এখানের মা-গঙ্গার মত শান্ত মেয়েটি নয়। এখানে মা গঙ্গাকে দেখে মনে হয় মা যেন কলসিতে জল নিয়ে ধীর পায়ে বাড়ি যাচ্ছে। ওখানে এই মেয়েই প্রচন্ড চঞ্চল, তার উন্মত্ত ঢেউ, তীব্রগতি, ঘোর গর্জন আরও একটা জিনিস যার জন্যে মা গঙ্গাকে আমি এড়িয়েই চলতুম বরাবর।

– কি সেটা?

– ঠাণ্ডা। একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু তখনতো উপায় নেই, চিক্‌চিকে জল দেখতে পেয়েই– 'ঝপাং' করে ঝাঁপিয়েছি জলে। তারপর কেবলই ভেসে চলা।

– কতক্ষণ লাগলো এখানে পৌঁছুতে?

– কতক্ষণ কিরে, বল কত দিন? তা সাড়ে তিন রাত আর তিনদিন লাগলো এখানে পৌঁছুতে। গতকাল ভোরে পৌঁছেছি। আরও আগে আসা যেতো, কিন্তু দিনের বেলা খুব অসুবিধা হত। হৃষীকেশ পার হবার পরই লোকজন– গিজ্‌গিজে মানুষ। তাই, হয় কোন বড় পাথরের খাঁজে কিংবা কোনও ঝোপে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকা। ভেসে যাওয়া কোন গাছের ডাল কিংবা কচুরিপানার চাওড় পেলে দিনের বেলাও সাঁতরেছি মাঝে মাঝে।

-- তখন তো তুমি অন্য বনেও চলে যেতে পারতে, পারতে না?

– পারতাম না। ওরা রেডিয়ো সিগন্যাল পাচ্ছিল, জীপ নিয়ে তাড়া করে আসছিল। অন্তত, হাজার মাইলের দূরত্ব দরকার ছিল। আবার ওদেরও দরকার দুজনের আবিষ্কার করা, আমার মাথায় গাঁথা, মাইক্রো কমপিউটারটা। পৃথিবীতে যা একটি মাত্রই আছে। এদিকে মুস্কিল, বড় জোর শ'খানেক মাইল পার হবার পর থেকেই দেখি মা-গঙ্গার পাড়ে জঙ্গল কোথারে, – শুধু শহর, গঞ্জ, গাঁ– মানুষের মেলা। বলতে গেলে তোদের এই হাতানিয়া– দোয়ানিয়া পেরুবার পর পেলুম মনের মত ভারি জঙ্গল। ওদিকে রেড়িয়ো সিগন্যালের সীমানাও পেরিয়ে গেছি অনেক আগেই।

– কিন্তু এই ক'দিন তো তাহলে উপোষ গেছে! মা গঙ্গার মধ্যে তো আর তোমার 'ইস্‌টোবেরি' নাকি সে সব ছিল না?

– স্টবেরী। আরে ওখানে স্টবেরী, পীচ, কারফল, আপেল, বাদাম আরও হাজার রকম ফল। আহ্ কি সোয়াদ!

– সেই তো, তা সে সব তো পাওনি তাহলে তো উপোষই!

– আরে বুদ্ধু, তা কেন হবে? আচ্ছা বল দেখি– তুই কি খাস?

– কেন, হরিণ, শুয়োর, খরগোস...

– বলে যা, বলে যা থামলি কেন? আরও একটা বাদ দিলি যে!

– কি আবার বাদ দিলুম?

– কেন, মাছ? বাঙালি বাঘ, তুই মাছ খাসনে?

– সে তো মাঝে মাঝে। অল্পজলে কিংবা খাঁড়িতে বাগে পেলে ধরি, খাই। কিন্তু বেশি জলে সুবিধে করতে পারিনা।

– আমাকে সুবিধে করতেও হয়নি। মাছের স্বভাব তো জানিস, স্রোতের বিপরীত দিকে ওরা ছোটে। আমি আসছি স্রোতের সঙ্গে– অনেক সময় এমন হয়েছে– আমার বুকে ধাক্কা খেয়েছে প্রকাণ্ড মাছ, আমি দুহাতে জাপটে ধরেছি, ব্যাস। আগে এত মাছ খাইনি যত এই ক'দিনে খেয়েছি। এই খানেই মনটা খারাপ হচ্ছে।

– কেন, এর মধ্যে মন খারাপের কি হল?

– এখানে ভালো ফলের গাছ দেখছি না বিশেষ। দু একটা ডুমুর গাছ, বটগাছ তার ফল পাকলে খাওয়া যায়, এমন কিছু স্বাদ নয়, তাও আবার হাজার খদ্দের, গুচ্ছের বাঁদর, পাখি তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি করে। কিছু নারকোল গাছ আছে, কিন্তু এই শরীর নিয়ে ওঠা মুস্কিল। বুঝতে পারছি, এখানে থাকতে হলে ওই মাছ কাঁকড়া চিংড়ি খেয়েই কাটাতে হবে। জংলি আতা, কলা পেয়ারা আছে তবে সে খুব কমই। শুধু একটাই সুখের খাদ্য আছে, এই যা।

– কি সেটা?

– কেন, মধু!

– ও বাবা, যা বড় বড় মৌমাছি তাদের বিষাক্ত হুলের খবর রেখেছো?

– রেখেছি, তাতে আমার ততো অসুবিধে নেই। আমার উলের কোট আছে না? তাতেই মৌমাছি ঠেকিয়ে দেবে।

– ওই মধু ভাঙতে মউলেরা নৌকো করে আসে, তাদের কাছে কখনও কখনও বন্দুকও থাকে, সে খবর জানো?

– জানি। তাদের চারভাগের একভাগতো তোদেরই পেটে যায়। তাছাড়া ওরা তোদের ভয়ে অত ভেতরে যায় না। বিরাট জঙ্গল। মধুর অভাব হবে না। এর মধ্যে একটা ভেঙ্গে খেয়েছি– চমৎকার স্বাদ।

– তুমি কি তবে এখানেই থেকে যাবে নাকি?

– উপায় কি বল? নিজের দেশ গাঁ ছেড়ে কারও কি ভালো লাগে? কত বিচিত্র খাবার দাবার, কি চমৎকার হাওয়া বাতাস, শীতকালে পর্বতের গুহায় জমিয়ে ঘুম,– গেল সে সব।

– সেখানে ফিরে আর যাবেই না?

– এখন তো নয়ই। ওই রেডিও সিগন্যালটা বন্ধ হলেও না হয় হত। কিন্তু উজান ঠেলে এই দীর্ঘপথ, এত শহরের মধ্যে দিয়ে, সে কি আর পারবো? ওই ভেতরের দিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ দেখেছি, তাতেই থাকতে হবে। তোদের কোন ক্ষতি করবো না– কিন্তু একটা শর্তে!

– কি শর্ত?

– তোরা আমাকে সম্মান করবি রাজা বলে– ঋক্ষরাজ।

– বাঘ বললে, – বেশ তাই হবে। •

নীতীশ বসু

সিম্পুর পক্ষিরাজ



বাবা আজ অফিস থেকে আসুক তারপর হবে। ঠাম্মা বলেছে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল এখনও আছে। বাবাকে কতবার বলেছে পক্ষিরাজ ঘোড়া কিনে দিতে, বাবা বলে কিনা এসব নাকি ঠাম্মার গল্পেই আছে। এ ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও পক্ষিরাজ ঘোড়া পাওয়া যায় না। আসলে বাবার কিনে দেবার ইচ্ছে নেই। বাবা দাদাভাইকে বেশি ভালোবাসে, যা চায় তাই কিনে দেয়। আমার বেলায় বলবে তোর অদ্ভুতুড়ে জিনিস কোথাও পাওয়া যায় না।

আজ বাবার কোন কথাই শুনবো না। বাবাকে পক্ষিরাজ ঘোড়া কিনে দিতেই হবে। পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে ইচ্ছে মত ঘোরা যায়। পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে কত রাজপুত্তর কত রাক্ষস-খোক্কস মেরেছে, রাজকন্যা উদ্ধার করেছে। এসব কথা বাবাকে বললেই বাবা এ-কথা সে-কথা বলে ভুলিয়ে রাখে।

নাহ্ বাবার আজও দেরি হচ্ছে। কী করে অফিসে কে জানে। পাশের বাড়ির রমেনকাকু কখন এসেছে। সামনের বাড়ির রিন্টির জ্যেঠুও। ওরা আগে আসে কেন বললে বাবা বলে সে তুই বুঝবি না।

সিম্পুর আরও অনেক কথা মনে পড়ে। হঠাৎ খোলা জানলায় চোখ পড়তেই চমকে ওঠে। সেকি এত গরমেও শীতের পোশাক পরে কে আসছে এ দিকে। ধুতির মতো কি পরেছে? পায়ে কেমন জুতো। হাঁটু পর্যন্ত মোজা। গলায় কী? লোকটার অদ্ভুতুড়ে পোশাক দেখে রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটার হাত থেকে আলোর মতো কি যেন বেরিয়ে গেল... আর কুকুরগুলোও লেজগুটিয়ে পালিয়ে গেল।

ওমা লোকটা যে আমাদের বাড়ির দিকেই আসছে। এখন কী হবে? বাবাতো অফিস থেকে এখনও আসেনি. ঠাম্মাতো দাদাভাইয়ের সঙ্গে ডাক্তার জ্যেঠুর বাড়িতে গেছে। আর মা-তো বিকেল হলেই বেরিয়ে যায় লাফিং ক্লাবে। বাড়িতে নাকি হাসতে পারে না। হাসতে না পারলে নাকি অসুখ হয়। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে মায়ের ঝগড়া হতো। বাবা এখন কোন কথা বলে না।

এমন সময় লোকটা ওর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার বাবা তো এখনও আসেনি। ঠাম্মাতো দাদাভাইয়ের সঙ্গে তোমার ডাক্তারজ্যেঠুর কাছে আর মা তো লাফিং ক্লাবে তাই না?

সিম্পু অবাক হয়ে বলে তুমি কে?

লোকটা বলল, দরজাটা খুলবে? আমার খুব শীত করছে।

সিম্পুর ভয় হল। মুখে বলল, তুমি কে? এই গরমেও বলছো শীত করছে। তুমি কোথা থেকে আসছো? লোকটা বলল, তুমি তো এতক্ষণ পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা ভাবছিলে তাই না?

সিম্পু এবার ভীষণ অবাক হয়। সে কি লোকটা কে? আমি পক্ষিরাজের কথা ভাবছিলাম একথা ও জানলো কি করে? আর আমার নাম!

লোকটা আবার বলল, কি হল সিম্পু দরজা খোলো আমার খুব শীত করছে।

সিম্পু দরজা খুলে দিল।

লোকটা ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বলল, ফ্যানটা বন্ধ করে দাও।

সিম্পু বলল, সে কি!

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, তুমি আমাকে দেখে অবাক হচ্ছো। এত গরমেও কেন শীতের পোশাক পরেছি। তোমার নাম তোমার বাড়ির খবর তারপর তোমার পক্ষিরাজের কথা জানলাম কি করে, তাই না?

শোন আমি আসছি সূর্যের দেশ থেকে। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক নারী পুরুষের মনের কথা জানতে পারি, নামতো সামান্য ব্যাপার। আসল কথা শোন, আমাদের দেশের তাপমাত্রা

আর তোমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা রাতদিন বললেও ভুল হবে। ভাগ্যিস আমার আসার সময় পিংপং বলেছিল, দাদু তুমি পৃথিবীতে যাচ্ছ যাও কিন্তু শীতের পোশাক পরে যেও। না হলে কষ্ট পাবে। এখন এখানে এসে বুঝলাম পিংপং সত্যি কথাই বলেছিল।

নিজে একটানা কথা বলতে বলতে সিম্পুকে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল, আরো শুনবে? আমাদের সূর্যের সাত সাতটা পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে। তাছাড়া আমাদের ওখানে প্রত্যেকের বাড়িতেই ছোটদের জন্য হরেক রঙের পক্ষিরাজ ঘোড়া আছে। তোমাদের এখানে যেমন উড়ো-যান, জল-যান, স্থল-যান আছে আমাদের ওখানে ওসব নেই। তোমাকে কি বলব, এসবে কোন মজাই নেই। সব যন্ত্রে চলে। ইচ্ছে মতো ঘুরতে পার না। আর আমাদের ওখানে তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে এ গ্রহে, সে গ্রহে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পড়াশুনো নেই শুধু খেলা আর খেলা। তোমাদের এখানে দ্যাখো ছেলেমেয়েদের বয়স তিন/চার হলেই ব্যাগে বই খাতা ঢুকিয়ে ইসকুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারপর দ্যাখো তোমাদের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে চাঁদে, মঙ্গলে, বুধে এমনকি বৃহস্পতি গ্রহেও যাবার চেষ্টা করছে। ভাবতে অবাক লাগে তোমাদের কোন কোন দেশ আবার গর্ব করে বলে, চাঁদে নাকি খুব শীগ্গির মানুষের বসবাসের সহজ উপায় হবে।

লোকটার কথা শুনতে শুনতে সিম্পু বলল, জল-যান, উড়ো-যান বুঝলাম কিন্তু স্থল-যান কী? লোকটা এবার হাসতে হাসতে বলল, আরে ট্রেন, বাস্, ট্যাক্সি... এসব দ্যাখোনি? এমন সময় সিম্পু খোলা জানালায় হঠাৎ দেখতে পেল নীল রঙের একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া উড়ে এসে খেঁজুর গাছের পাশে চিঁ... হিঁ... হিঁ... শব্দ করে দাঁড়ালো। সিম্পু চমকে উঠলো। মনে মনে ভাবলো ঠাম্মা যেরকম বলেছিল ঠিক সেরকম। সিম্পু বলল, ওই তো পক্ষিরাজ ঘোড়া। লোকটা বলল, আরে ওর পিঠে চড়েই তো তোমাদের পৃথিবীতে এসেছি।

সিম্পু বলল, তাহলে তোমার পক্ষিরাজ ঘোড়াটাকে আমাকে দাও।

লোকটা যেন চমকে উঠল, মুখে বলল, ও মা সেকি! তাহলে আমি ফিরব কি করে? তোমাদের বিজ্ঞানীদের রকেটে চড়ে তো যাওয়া যাবে না। ও তো সূর্য থেকে দশলক্ষ কিলোমিটারের আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি ফিরে গিয়ে তোমার জন্যে একটা ছোট্ট পক্ষিরাজ ঘোড়া পাঠিয়ে দেব। একটু থেমে বলল, একটা সমস্যা আছে।

সিম্পু বলল, সমস্যা?

লোকটা বলল, সমস্যা মানে? মানে একসময় তোমাদের পৃথিবীতেই পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল। ওদেরকে তো পৃথিবীর নিষ্ঠুর মানুষরাই শেষ করে দিয়েছে।

সিম্পু মনে মনে ভাবে ঠাম্মা তাহলে সত্যি কথাই বলেছে। সত্যি বড় মানুষগুলো ভারি নিষ্ঠুর। সিম্পুকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা বলল, কী ভাবছো?

এমন সময় খেঁজুর গাছের পাশে দাঁড়ানো পক্ষিরাজ ঘোড়ার চিঁ... হিঁ... হিঁ... শব্দ শুনেই লোকটা বলে উঠল আর বসা যাবে না আমাকে এখন যেতে হবে। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে গল্প করবো, তা আজ আর হল না। আজ উঠি, আর একদিন এসে গল্প করা যাবে।

সিম্পু বলল, আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া?

লোকটা বলল, গিয়েই পাঠিয়ে দেব। বলেই লোকটা চলে গেল। সিম্পু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো।

ঘন ঘন কলিং বেলের শব্দ আর দরজা ধাক্কার শব্দ শুনে পাশের বাড়ির টুসির মা বলল কী হল সমরদা? ঘরে কেউ নেই?

সিম্পুর বাবা বলল, দরজায় তো তালা লাগানো নেই। ভেতর থেকেই বন্ধ।

টুসির মা বলল, তাহলে সিম্পু নিশ্চয়ই আছে।

সিম্পুর বাবা খোলা জানালার কাছে গিয়ে দেখল সোফার উপর সিম্পু ঘুমিয়ে আছে।

সিম্পুকে বার কয়েক ডাকতেই সিম্পু চমকে উঠে বলল, বাবা তুমি এখন এলে, একটু আগে এলে.... বলেই দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

সিম্পুর বাবা ঘরে ঢুকেই বলল, বাড়িতে তুই একা। তোর ঠাম্মা, দাদাভাই তারপর তোর মা এরা কোথায়?

সিম্পু বলল, দাদাভাই ঠাম্মাকে নিয়ে ডাক্তারজ্যেঠুর কাছে গেছে। আর মা তো বিকেল হলেই লাফিং ক্লাবে যায়।

সিম্পুর বাবার রাগ হল। মনে মনে ভাবলো কতবার সিম্পুর মাকে বলেছে সিম্পুকে একা রেখে না যেতে।

সিম্পু বলল, কী হল বাবা...

সিম্পুর দিকে তাকিয়ে সিম্পুর বাবা বলল, তোর জন্যে আজ পক্ষিরাজ ঘোড়া এনেছি।

সিম্পু লাফিয়ে উঠে বলল, পক্ষিরাজ।

সিম্পু দেখল ওদের গাড়ির ড্রাইভার সুমন গাড়ি থেকে একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে এল ঘরে।

সিম্পু বলল, এ তো কাঠের ঘোড়া।

সিম্পুর বাবা বলল, আরে বোকা এর পিঠে আগে বস। সিম্পু ওর বাবার কথামত ঘোড়ার পিঠে বসতেই ওর বাবা ঘোড়াটাকে দুলিয়ে দিল।

সিম্পু বলল, আরে এ যে দুলছে, ছুটছে কোথায়? উড়ছে কোথায়?

ওর বাবা বল, প্রতিদিন ওর পিঠে চড়ে এভাবে দুলতে দুলতে দেখবি– একদিন সত্যিকারের পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে গেছে।

সিম্পু ঘোড়ার পিঠে দুলতে দুলতে বলল, জানো বাবা আজ অদ্ভুতুড়ে পোশাক পরে একটা লোক পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে সূর্যের দেশ থেকে এসেছিল। এত গরমেও শীতের পোশাক। খুব শীগ্গির আমার জন্যে একটা পক্ষিরাজ ঘোড়া পাঠিয়ে দেবে।

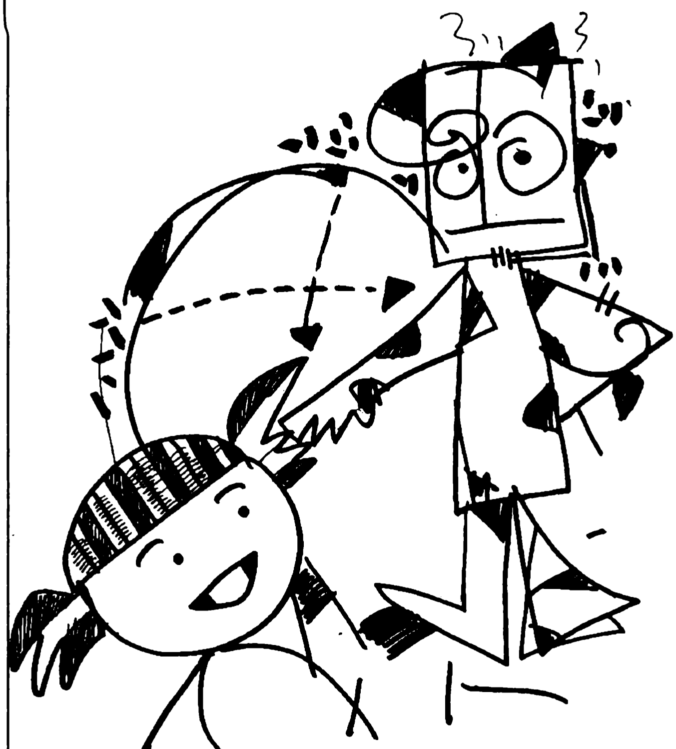
সিম্পুর কথা শুনে ওর বাবা বলল, আমি তো জানালা দিয়ে দেখলাম তুই সোফার উপর ঘুমোচ্ছিলি। পক্ষিরাজের কথা ভাবতে ভাবতে এরকম অদ্ভুতুড়ে স্বপ্ন দেখছিলি। যা বাথরুম থেকে ভালো করে চোখ মুখ ধুয়ে আয়। আজ তোর মা আসুক তারপর কথা হবে।

সিম্পুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, কি রে, দাঁড়িয়ে আছিস যে। যা ভালো করে চোখ মুখ ধুয়ে আয়।

সিম্পু কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকে ভাবতে লাগলো, তাহলে? তাহলে সেই লোকটা, খেঁজুর গাছের পাশে দাঁড়ানো পক্ষিরাজ ঘোড়াটা?

মানিক সাহা

মঙ্গলগ্রহের মঙ্গলদা



হঠাৎ ঝুমকির হাত থেকে গ্যাস বেলুনটা উড়ে গেল। ঝুমু কাকার কাছে জানতে চাইল– আচ্ছা কাকা, বেলুনটা কোথায় গেল। কাকা খুশি হয়ে বলল– অনেক দূরের আকাশে।

'আকাশ থেকে কোথায় যাবে।'

'সেই দূরের মঙ্গলগ্রহে।'

'মঙ্গলগ্রহ কোথায়। সেখানে মানুষ থাকে না?'

'এসব পরে জানবে। এখন বাড়ি চল্।'

এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। সেই প্রথম কাকার কাছে মঙ্গলগ্রহের নাম শুনেছিল ঝুমু। তারপর কতবার যে এ নিয়ে বাবার কাছে জানতে চেয়েছে তার অন্ত নেই। বাবাও কাকার মত নিরাশ করে। বলে 'বড় হলে অনেক বইপত্র পড়বে। তখন সবকিছু জানতে পারবে।'

ঝুমকিদের বাড়ি থেকে স্কুল বেশ কিছুটা দূরে। প্রতিদিন রিকশা করে স্কুলে যায় ঝুমু। তার মন জুড়ে খেলা করে মঙ্গলগ্রহের নানা চিন্তা ভাবনা। এ গ্রহ যেন তার কাছে কত চেনা। কত জানা। এসব আকাশকুসুম চিন্তা সে কাউকেই বলে বোঝাতে পারবে না।

একসময় ঝুমু বাবার কাছে জানতে চায়– 'আচ্ছা বাবা, মঙ্গলগ্রহ কেমন। বাবা খুশি হয়ে বলে– 'মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর মতো। সেখানে আলো বাতাস সবকিছু আছে।'

'জল আর গাছপালা আছে?'

'সেসবও আছে। তবে মানুষ আছে কি না এখনও জানা যায়নি।'

আচ্ছা বাবা, কি করে মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যায়?

'শুধু মন দিয়ে পড়াশুনা করলেই...।'

'রাতদিন পড়াশুনা করলেই মঙ্গলগ্রহে যাওয়া যাবে?'

'পড়াশুনা করে ঈশ্বরকে খুশি করলে অবশ্যই সেখনে যেতে পারবে।'

ঝুমকি বাবার কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। সেই থেকে শুরু হয় রাত জেগে বই পড়া। তারপর ক্লাসে প্রতিবারই প্রথম হয় সে।

আস্তে আস্তে অষ্টম শ্রেণীতে পা রাখল ঝুমু। রূপে-গুণে একজন লক্ষ্মী মেয়ে বলতে যা বোঝায় ঝুমকি ঠিক তাই। পাড়ার লোকেরাও এক কথায় প্রশংসা করে।

এমনিতেই তাদের বাড়িটা খুব সুন্দর। তার উপর পড়াশুনার পক্ষে বাড়িটা বেশ নির্জন। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে ঝুমু তখনও পাঠ্য বই-এ মগ্ন থাকে। তার মনে একটাই সাধনা, 'পড়াশুনো করে ঈশ্বরকে খুশি করতে হবে। যে করেই হোক মঙ্গলগ্রহে যেতেই হবে।'

এরমধ্যে এক রাতে 'মঙ্গলগ্রহের বিচিত্র কাহিনী' বইটি পড়ছিল ঝুমু। ততক্ষণে বাড়ির লোকেরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। বই পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না।

একজন লোক ঝুমকিকে মিষ্টি সুরে বলল 'ঝুমু মঙ্গলগ্রহে যাবে?'

সত্যি নিয়ে যাবে?

লোকটি হাসি মুখে বলে– 'অবশ্যই নিয়ে যাব। তুমি আমার হাতটা শক্ত করে ধর।'

ঝুমকি লোকটির হাত ধরা মাত্র ঝড়ের গতিতে কোথায় যেন উড়ে গেল!

'এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে, ভাই!'

'এটাই তো মঙ্গলগ্রহ।'

'এ তো পৃথিবীর মতই। গাছপালা পশুপাখি সবই আছে।'

'এখানকার মানুষগুলো খুব সুন্দর। খুব নির্মল। এরা প্রাণ খুলে হাসতে জানে।'

'কিন্তু তার আগে বল তুমি কে! তোমার পরিচয়ই তো জানা হ'ল না।'

'আমাকে চিনবে না। আমি মঙ্গলগ্রহের মঙ্গলদা। শীত, গ্রীষ্ম বার মাসই এখানে থাকি। ঈশ্বরের আদেশে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাই।'

'হঠাৎ আমার কাছে গেলে কেন?'

'ঈশ্বর তোমার প্রতি মুগ্ধ হয়েছেন। তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠালেন।'

'তাহলে তো বেশ মজার কথা!'

'হ্যাঁ, মজার কথাই বটে। ঈশ্বর, তাঁর প্রিয় মানুষদের কোন ইচ্ছায় অপূর্ণ রাখে না। চল তোমাকে সবকিছু ঘুরে দেখাই।'

ঝুমকি ঘুরে ঘুরে দেখল, গাছে গাছে রঙ-বে-রঙের পাখি। নদীতে কাচের মত জল। সেখনে খেলা করে বিচিত্র ধরনের

মাছ। মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। ঝুমু অভিভূত হয়ে গেল।

'এ তো স্বপ্নের দেশ।'

'একটু আগেই তো বললে এ তো পৃথিবীর মতই।'

'তখন তো এতকিছু দেখিনি।'

'এই গ্রহটাও পৃথিবীর মতই। তবে পৃথিবীর থেকে একটু আলাদা।'

'কেমন।'

'এই যেমন ধর এখানকার মানুষগুলো মিথ্যা কথা বলে না। এখানে ধর্মের কোন বিভেদ নেই। একটাই জাতি, সেটা হল মানুষ জাতি।'

'কিন্তু পৃথিবীতে এই নিয়ে কত গন্ডগোল। এমন কোন দিন নেই, যেদিন দু'চার জন মানুষ অকারণ মরে না।'

'আসলে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে মনুষত্বের বড় অভাব। অথচ মানুষগুলো আগে কিন্তু এরকম ছিল না।'

'কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব অবাক হচ্ছি, মঙ্গলদা।'

'কি বিষয় বল?'

'বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের কোন অস্তিত্ব পায়নি। আমি তো দেখছি গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন সবই রয়েছে।'

'আসলে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের কোন একটা অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করেছে। পুরো মঙ্গলগ্রহটা তাদের আয়ত্বে আসেনি।'

'কেমন! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না?'

'এই যেমন ধরো ভারত একটি দেশ। মঙ্গলগ্রহ থেকে কেউ যদি সাহারা মরুভূমিতে যায়, সে তো ভাববে ভারত মরুভূমির দেশ। ব্যাপারটা ঠিক এই রকম। একটা অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করে যেমন সমস্ত দেশের বিচার করা যায় না। তেমনি অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গবেষণা করেও একটি গ্রহের সবকিছু আবিষ্কার করা যায় না। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা যেটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছে, সেটুকু মঙ্গলগ্রহের নমুনা মাত্র।'

'বাঃ মঙ্গলদা, তুমি তো বেশ সুন্দর করে বোঝাও!'

'সুন্দর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলতে হয়। এটাই তো নিয়ম।'

হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ঝুমকির। পূবের আকাশে তখনও সূর্যের আভা ফোটেনি।

'কি মঙ্গলদা, মঙ্গলদা করছিস। তাড়াতাড়ি উঠে পড়। পড়তে যেতে হবে না?' ঝুমুর তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি। খাটের উপর কোন ক্রমে উঠে বসে।

'কোথায় গেলে মঙ্গলদা। এই তো আমি এখানে।'

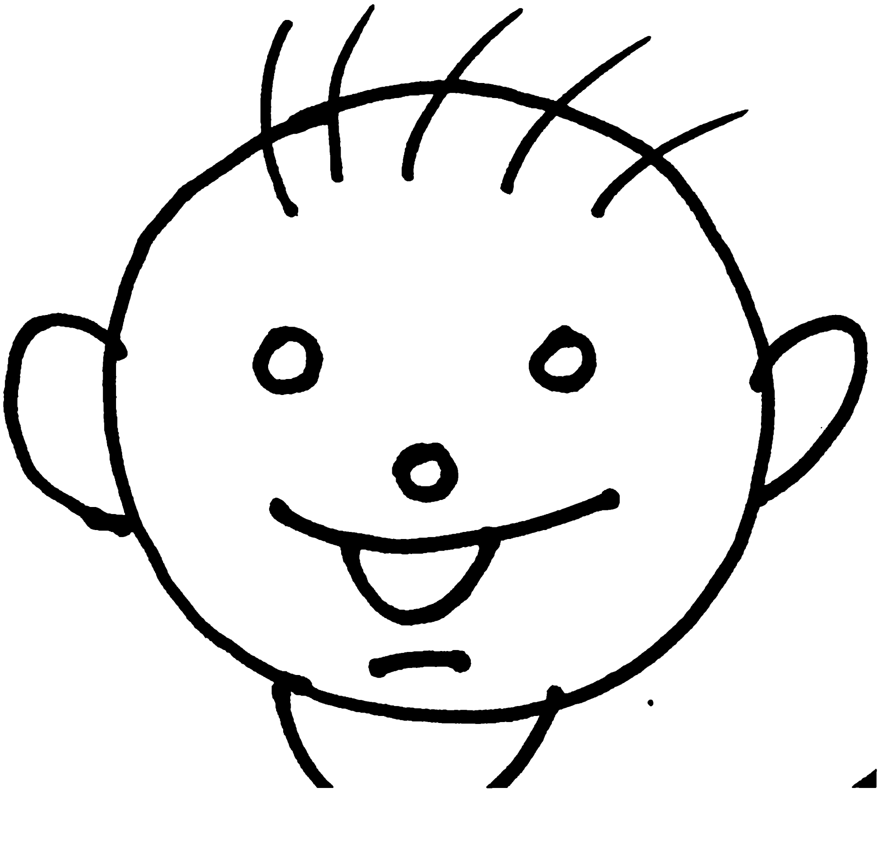
'কোথায় তোর মঙ্গলদা। কি আবোল তাবোল বলছিস' মা গায়ে হাত দিয়ে বলে।

এতক্ষণ পরে ঝুমকি বুঝতে পারে সে মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিল, নাকি সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখছিল।

সৃজনী বারিক

মুখ

কারো মুখ গোলগাল
কারো মুখ চৌকো
কারো হাসি পরিপাটি
কারো হাসি নৌকো
কারো মুখ ফ্যাকাশে
চিন্তায় ভর্তি–
কারো মুখে হরদম
লেগে আছে ফূর্তি
কারো মুখে ক্লান্তি
ঘুমে চোখ বন্ধ
কারো মুখ সুশ্রী
কারো মুখ মন্দ।



জয় ভৌমিক

দিয়ার ভুবন

এখনো উঠল না মেয়েটা– ছ'টা বাজে। প্রায় হাহাকার করে উঠল তৃণা। পাঁচ বছরের দিয়া– তৃণা আর সুনন্দের একমাত্র সন্তান। ভাল নাম বর্ষা। এই শুনছো তোলো না মেয়েটাকে, যত দায় যেন আমার। – রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে তৃণার কাতর কিন্তু উচ্চ কণ্ঠস্বর। সকালের এই সময়টায় এটাই পরিচিত ছবি এই বাড়ির। সুনন্দ প্রায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসে দিয়াকে। আঁধবোজা চোখে দিয়া কিছু বলার আগেই তৃণা পেস্ট লাগানো জুনিয়র টুথব্রাশটি ঠেলে দেয় ওর মুখে। মুধ ধুয়ে খানিকটা প্রকৃতস্থ হয় দিয়া। সাতটা দশে স্কুলের গাড়ি আসবে বড় রাস্তায়। সাতটায় বেরোতে হবে দিয়াকে। যদিও স্কুল বসে আটটা বেজে তিরিশ মিনিটে। এই দীর্ঘ সময় দিয়া তার বন্ধুদের তুলতে তুলতে আধো ঘুমে আধো জাগরণে অতিক্রম করে শহরের অনেকটা রাস্তা। ছোট্ট দিয়ার ছোট্ট স্বপ্নগুলোও ছকে বাঁধা জীবনের মত আবর্তিত হয়ে চলে।

সুনন্দ আর তৃণার ছোট্ট সংসার। বাইপাসের ধারে নতুন গড়ে ওঠা এই পাড়ায় ওরা উঠে এসেছে বছর দুয়েক হল। আগে ওরা থাকত হালতুতে– ওদের পৈতৃক বাড়ি। সেখানে এখন সুনন্দের বাবা-মা আর ছোট ভাই থাকে। সুনন্দ একটা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির ভাল পদে আছে। এম.বি.এ. পাশ করে এক দিনও বসে থাকেনি সুনন্দ। এটা তার তৃতীয় চাকরি। যত দিন যাচ্ছে সুনন্দ তার স্ট্যাটাস বাড়িয়ে চলেছে বেশ অনায়াস গতিতেই। ক্রমশই বেড়ে চলেছে চাহিদা– সার্বিকভাবে ভাল থাকার। এই ভাল থাকার যাঁতা কলে কিন্তু ক্রমশ আটকে যাচ্ছে একটা ছোট প্রাণ। তৃণা আর সুনন্দের সম্পর্ক সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে। তৃণা বড়লোকের একমাত্র মেয়ে। উচ্চশিক্ষিত কিন্তু সুনন্দের সংসারে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছে নিজেকে। দিয়া এখন তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। সুনন্দর অনায়াসে বেড়ে চলা স্ট্যাটাসের সঙ্গে তাল মেলাতে সে দিয়াকে অবলম্বন করেছে।

তৃণার অস্তিত্ব বলতে এখন শুধুই দিয়া। জীবনের কোন ক্ষেত্রে সে দিয়ার পিছিয়ে পড়ার, আটকে পড়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। নিজের মত করে গড়ার জন্যই তৃণা স্বামী-কন্যাকে নিয়ে উঠে এসেছে বাইপাসের ধারে। মূলত তৃণার চাওয়াতেই হালতুর বাড়ি ছেড়েছে সুনন্দরা। সুনন্দও আপত্তি জানায়নি– হয়ত মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই। বৌমা মেয়েকে যদি মানুষের মত মানুষ করতে চাও তবে ওর ছেলেবেলাটা ওর মত করে কাটাতে দাও। ওকে যন্ত্র বানানোর চেষ্টা করোনা-– শ্বশুর মশাইয়ের এই সব কথাবার্তা তৃণার কাছে রীতিমত ভয়ের কারণ ছিল। তার উপর দিয়ার ঠাকুমার অপার রূপকথার ভান্ডার। ঠাকুমার ঘরে ঢুকলে দিয়াকে বার করে কার সাধ্যি। সেইসব দিনের কথা ভাবলে আজও যেন আঁতকে ওঠে তৃণা। এখনও ঐ বাড়িতে থাকলে কি অবস্থাটাই না হত দিয়ার সেই কথা ভাবতে গিয়ে বেশিদূর এগোতে না পেরে অন্য কাজে মন দেয় তৃণা। তবে একথাও সত্যি যে তৃণার চাওয়ার সাথে মিশে আছে সুনন্দরও কিছু ভাল লাগা।

নতুন জায়গায় উঠে এসে তৃণা আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেনি। দিয়াকে ভর্তি করে দিয়েছে দক্ষিণ কলকাতার এক নামি ইংরাজি স্কুলের লোয়ার নার্সারি ক্লাসে। সপ্তাহে তিন দিন সাঁতারে যায় দিয়া। দুদিন নাচের ক্লাস। একদিন ছবি আঁকতে যায়। স্কুলের পড়া করানোর জন্য একজন মিস্ আসেন তিনদিন। আর আছে যোগব্যায়ামের ক্লাস সপ্তাহে দু'দিন। দিয়ার টাইট সিডিউল যে কোন উচ্চপদস্থ আমলার কর্মব্যাস্ততাকেও এক হাত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্কুলে যে ব্যাগটা নিয়ে যায় দিয়া সেটির ওজন দিয়ার ওজনের প্রায় সমান। গত ন'মাস ধরে দিয়ার এই বহুধা বিস্তৃত কর্মকান্ড আরও খোলতাই রূপ ধারণ করেছে। যে স্কুলে এখন দিয়া পড়ে তার নামটা, কি তৃণা, কি সুনন্দ কারও কাছেই সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। তাই দিয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে স্পেশ্যাল টিচার। এই টিচার নাকি ধন্বন্তরি। বলে বলে নামি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চান্স পাইয়ে দেয়। নতুন স্কুলে চান্স পেলে দিয়াকে আরও ভোরে উঠতে হবে। দূরত্ব বেশি তাই পৌনে সাতটায় বাস আসবে। সে সব নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় তৃণা-সুনন্দ। তারাও এখন রীতিমত পড়াশুনো করছে। কারণ এইসব নামি স্কুলগুলোতে বাবা-মায়ের পরীক্ষাটাই বেশি নেওয়া হয়– ওজন বোঝার জন্য। দিয়ার একটা পুতুলের বাক্স ছিল ও বাড়িতে-– ঠাকুমা সাহায্য করত পুতুলের জামা তৈরি করতে। কিন্তু মায়ের পছন্দ নয় বলে দিয়াকে রেখে আসতে হয়েছে সেই বাক্স। অবশ্য সে কয়েকটা বার্বি ডল্ পেয়েছে এখন– কিন্তু পুতুলের বাক্স ভোলা হয়ত সম্ভব নয়। এত কিছুর পরও টিভি দেখে দিয়া। তার সব থেকে প্রিয় 'স্মল ওয়ান্ডার'। একটি যন্ত্র মানবীর কাহিনী– হয়ত বা নিজেকেই খোঁজে ওর মধ্যে।

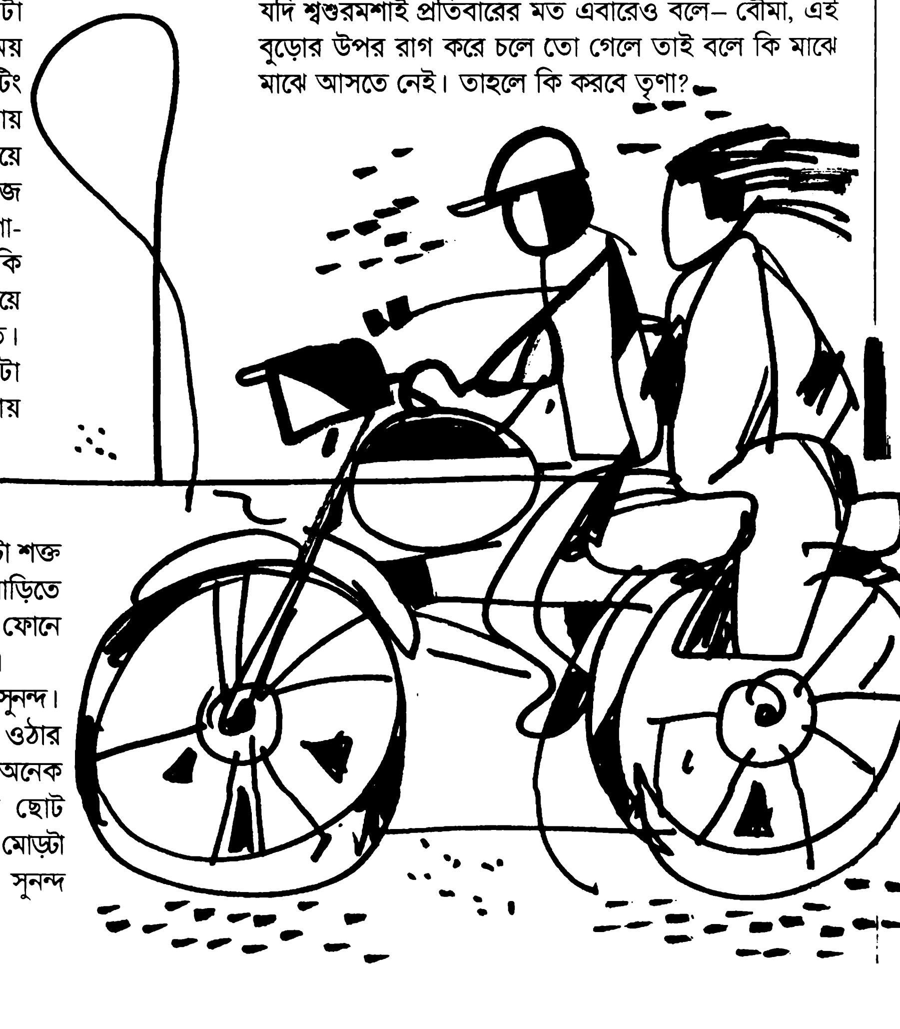
আজকের সকালটা আর পাঁচটা দিনের থেকে আলাদা। বিগত এক বছরের লড়াইয়ের অবসান হবে আজ। নামী স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে দিয়া। নামটা শেষের দিকে হলেও উতরে গেছে। হয়ত স্পেশাল টিচারেরই কেরামতি। আজ তারই চূড়ান্ত বাছাই। দিয়ার সঙ্গে তার বাবা মায়ের ইন্টারভিউ-– অবশ্যই এক সাথে নয়। সময় বিকাল চারটে। সাড়ে তিনটেয় রিপোর্টিং টাইম। এতটাই কড়াকড়ি যে ইন্টারভিউ মিস্ করলে কিছুই করার থাকবে না। তৃণা পাখি পড়ানোর মত একমাস ধরে দিয়াকে বুঝিয়ে চলেছে ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পর্কে, তৈরি করে চলেছে ইন্টারভিউ-এর জন্যে। দিয়ার পুরোনো স্কুলে আজ একটা ক্লাস টেস্ট আছে। ওটা কামাই করা চলবে না। স্কুল থেকে ফেরে দেড়টায়। এসেই আজ ছুটবে ইন্টারভিউ দিতে। সুনন্দ আজ অফিসে যাবে না– আগেই বলা আছে। নিজের কিছু কাজ আছে, সেগুলো সারবে আর বিকালে ইন্টারভিউ। সকাল থেকে আজ অবিরাম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়ে চলেছে। বিচ্ছিরি এই অবিরাম বৃষ্টি সকাল থেকেই তৃণার

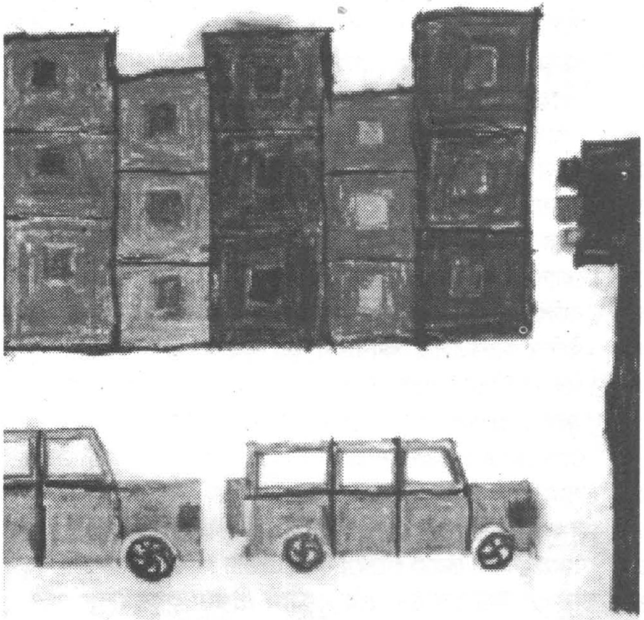
মনটাকে ভার করে রেখেছে। সুনন্দ ব্যাঙ্কে গেছে, আসতে আড়াইটে বাজবে। ও এল্লেই তৃণারা বেরোবে। দিয়া সাধারণত দেড়টার আশেপাশেই বাস থেকে নামে। বাস স্ট্যান্ড থেকে হেঁটে আসতে আরও মিনিট দশেক। তিনটে বাড়ি আগে একটা মেয়ে থাকে– রিমা। দিয়ার স্কুলেই পড়ে দু ক্লাস উঁচুতে। বাস স্ট্যান্ড থেকে ওর সঙ্গেই ফেরে দিয়া। তৃণা দ্রুত গতিতে সব কাজ সারছে। বর্ষার দিনে কাজ যেন এগোয় না। হঠাৎ তৃণার চোখ পড়ল ঘড়ির দিকে দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল তৃণার। হঠাৎই হাত পাগুলো কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করল রিমার বাড়িতে। রিমাই ধরল ফোনটা। সে আজ স্কুলে যায়নি। উত্তর না দিয়েই ফোনটা কাটল তৃণা। দমটা যেন আটকে আসছে। অগোছালো কিছু চিন্তা বুকটাকে যেন চেপে ধরছে। ক্রমশ শীতল হচ্ছে হাত পা। সুনন্দকে মোবাইলে পেল না, বোধ হয় ব্যাঙ্কের ভেতরে আছে। আউট অফ রিচ্। চোখের জল আর বাঁধ মানছে না– আপনিই বেরিয়ে আসছে। ঘড়িতে দুটো পঁয়ত্রিশ। হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠল। পাগলের মত ছুটে গিয়ে দরজা খুলল তৃণা– সুনন্দ এসেছে। দিয়া এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি, রিমা স্কুলে যায়নি– কান্না ভেজা স্বরে তৃণা এক নিশ্বাসে বলল কথাগুলো। সুনন্দ শক্ত করে ধরল তৃণাকে– স্কুলে ফোন করেছিলে? নিশব্দে দু পাশে মাথা নাড়ায় তৃণা। স্কুলে ফোন করে সুনন্দ। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। হেলমেটটা আবার মাথায় দিল সুনন্দ– আমি একবার স্কুল থেকে ঘুরে আসি। আমিও যাব– তৃণা অস্থিরভাবে অনুনয় করে। না তৃণা তুমি থাক, এর মধ্যে যদি দিয়া এসে যায়। ডুকরে উঠল তৃণা। ঘড়িতে তিনটে বাজতে পাঁচ।

চেয়ারে এসে বসল তৃণা। বৃষ্টিটা একইভাবে হয়ে চলেছে। চারটের সময় ইন্টারভিউ ছিল। সাড়ে তিনটেয় রিপোর্টিং টাইম। কথাটা মনে আসতেই দিয়া কোথায় কিভাবে আছে ভেবে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল তৃণার। চোখের জলের তো আজ বাধ ভাঙা উল্লাস। ফোনটা হাতে নিল তৃণা- – ও বাড়িতে একটা খবর দেবে। কি বলবে– দিয়া হারিয়ে গেছে! সেই কি হারিয়ে দিল দিয়াকে। পারল না ফোন করতে। ঘড়িতে তিনটে চল্লিশ। কলিংবেলটা নিস্তব্ধতা চিরে বেজে উঠল– দরজায় সুনন্দ। স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, দারোয়ান সঠিক কিছু বলতে পারল না– সুনন্দের চোখও এবার চিকচিক করে উঠল। চল থানায় একটা ডায়েরি করি, চোয়ালটা শক্ত করে সুনন্দ তাকাল তৃণার দিকে। ও বাড়িতে একটা ফোন করল সুনন্দ। বাবা ধরেছে, ফোনে কি কথা হল তা তৃণার কানে ঢুকল না।

বাইকের পেছনে তৃণাকে তুলে স্টার্ট দিল সুনন্দ। বৃষ্টিটা যেন একটু ধরেছে। বাস রাস্তায় ওঠার আগে দুটো মোড় ঘুরতে হয়। এদিকটা অনেক নতুন বাড়ি হচ্ছে। ইট বালি আর ছোট কনস্ট্রাকশন্ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দ্বিতীয় মোড়টা ঘুরতেই চিৎকার করে ওঠে তৃণা– সুনন্দ দাঁড়াও। একটা গাঢ় নীল স্কার্ট দেখেছে তৃণা, বালির স্তূপ আর সবে শুরু হওয়া একটা বাড়ির ফাঁক দিয়ে। যেন উবু হয়ে বসে আছে কেউ। বাইকটা রাস্তা থেকে নামিয়ে নতুন বাড়ির দিকে নিতেই পরিচিত বাইকের শব্দে নীল স্কার্ট পরা মেয়েটি ছুটে আসে– দিয়া। বাপী-মা দেখবে এস। তৃণা-সুনন্দকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই টানতে টানতে নিয়ে যায় দিয়া। সবে শুরু হওয়া বাড়ির এক কোণায় দিয়ার স্কুলব্যাগের মধ্যে বসে তিরতির করে কাঁপছে একটা কুকুরছানা। এমন নিস্পাপ মুখ ভাল না বেসে থাকা যায় না। বাস থেকে নেমে বাড়ি আসার সময় বালির ধারে কুকুর ছানাটিকে দেখতে পায় দিয়া। বৃষ্টিতে ভিজে বালির সঙ্গে সেঁটে ক্ষীণস্বরে কুঁই কুঁই করছিল। ওঠার শক্তি ছিল না। দিয়া তাকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এসেছে। স্কুলের ব্যাগটা খালি করে তাঁবুর মত বানিয়েছে। তার মধ্যে রেখেছে ছোট্ট কুকুরছানাটাকে। নিজের আধখাওয়া টিফিন ওর সামনে দিয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে সারা গা। কুকুরছানাটি এখন অনেকটা সুস্থ। দিয়ার খেয়ালই ছিল না সময় কোথা থেকে গড়িয়ে গেল এতটা। খেয়াল ছিল না নতুন স্কুলের ইন্টারভিউ। ওর দুচোখে তখন কুকুরছানার মায়া। ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটু দুধ খেতে দেবে মা– বল না মা দেবে তো? দিয়া মার আঁচল ধরে টানতে থাকে। তৃণা আর চুপ করে থাকতে পারে না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বুকে তুলে নেয় দিয়াকে। বাইক স্টার্ট দেয় সুনন্দ চারজনকে নেয়ে। ঘড়িতে চারটে বেজে পাঁচ।

দিয়ার ঠাকুমা আর কাকু এসেছে দিয়ার সাথে দেখা করতে। আসছে মঙ্গলবার দিয়ার জন্য মঙ্গলচন্ডীর ব্রত করছে ওর ঠাকুমা। তাই তৃণাদের বলতে এসেছে। তৃণারা যাবে। আর যদি শ্বশুরমশাই প্রতিবারের মত এবারেও বলে– বৌমা, এই বুড়োর উপর রাগ করে চলে তো গেলে তাই বলে কি মাঝে মাঝে আসতে নেই। তাহলে কি করবে তৃণা?





আকাশ গাঙ্গুলী
তৃতীয় শ্রেণী
বিদ্যাভবন, উত্তরপাড়া

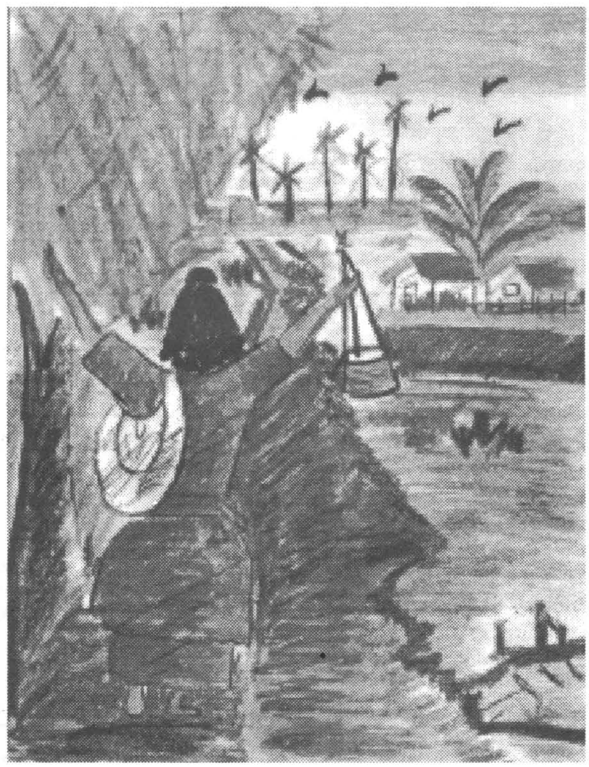


মুহসীনা মোস্তফা
ষষ্ঠ শ্রেণী
বাংলাদেশ

ইমন বারিক
পঞ্চম শ্রেণী
রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দির, সরিষা



মধুরিমা মৌলিক
ষষ্ঠ শ্রেণী
সেন্ট টেরেজাস সেকেন্ডারি স্কুল, কলকাতা



গোধূলি শর্মা

স্বপ্নিল



'নাম' আমাদের জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। একটা নাম আমাদের জীবনের রঙ বদলে দিতে পারে। নামের মধ্যে দিয়ে মানুষটার ভেতরের ইচ্ছা বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। কোনো এক নবজাতকের জন্মের পর তার মা, বাবা তাকে ঘিরে কত স্বপ্ন দেখে একটা নাম দেয়। যেন সেই নাম তার জীবনের, তার আদর্শের, তার স্বভাবের প্রতীক স্বরূপ।

মা-বাবাও তাই শখ করে ছেলের নাম রাখল স্বপ্নিল। নাম কী আর কেউ অত চিন্তা করে রাখে? নামটা ওদের পছন্দ হয়ে গেছিল। কিন্তু ওরা কী স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল ওদের এই 'স্বপ্নিল' ওদের স্বপ্নকে সফল করতে পারবে কি না।

ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে স্বপ্নিল। সে সত্যিই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। বই পড়তে পড়তে সে হারিয়ে যায় তার কল্পনার রাজ্যে। দুদিকের অশান্তি, ঝগড়া, তাকে স্পর্শও করতে পারে না। স্বপ্ন তো সকলেই দেখে। কিন্তু স্বপ্নিলের স্বপ্ন অন্য ধরনের। তার স্বপ্ন রঙের তুলিতে আঁকা। স্বপ্নে সে যেন নিজেকে নিজের মত করে খুঁজে পায়। স্কুলের পরীক্ষায় 'প্রিয় শখ' লিখতে গিয়ে সে লিখল 'স্বপ্ন দেখা', লিখতে লিখতেও সে চলে গেল তার স্বপ্নের রাজ্যে। কিন্তু কি অদ্ভুত মাস্টারমশাইরাও তার লেখা দেখে অবাক। ক্লাসে মাঝারি মেধার স্বপ্নিল কিভাবে এত সুন্দর লিখল, তা তাদের কাছেও স্বপ্নস্বরূপ।

এভাবেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে স্বপ্নিলের দিনগুলো ভালোভাবে কেটে যাচ্ছিল। তখন সে নয় কি দশে পা দিয়েছে। হঠাৎই ঘটে গেল সেই ঘটনাটা। মার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না কদিন ধরেই। বাবাকে সে বলতে শুনেছে যে তার মা আর বাঁচবে না। তার মায়ের রক্তে প্রবেশ করেছে সেই কালকেউটের বিষ, যার সঞ্জীবনী এখনও আবিষ্কার হয়নি। ডাক্তারকাকু অবশ্য খোলাখুলি কিছুই বলেনি, তবে কপালের ভাঁজ সেই ইঙ্গিতেই দেয়– ক্যান্সার। মা যদি না থাকে, তাহলে এ জীবন তার কাছে তুচ্ছ। মার ঘুমপাড়ানি গান আর হাতের ছোঁয়ায় তার স্বপ্নগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। স্বপ্নে সে দেখেছে যে তার মা আবার আগের মত ভালো হয়ে উঠেছে। স্বপ্নের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। দিনটা ছিল শনিবার। তাই স্কুল থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সে দেখে বাড়ি একেবারে শোকস্তব্ধ, রুনুমাসি, মামা, বড়মাসি, টাম্মা, সবাই এসেছে। সকলের চোখে জল। কারণটা সে বুঝতে পারছে না কিছুতেই। শেষে পিমা বলল, 'তোর মা... তোর মা... তোকে ছেড়ে চলে গেছে।' স্বপ্নিলের কাছে এ যেন স্বপ্ন। সে এক ছুটে মায়ের ঘরে ঢুকে দেখল, খাটের ওপর সাদা চাদরে ঢাকা তার মা শুয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছিল তার হৃদপিন্ড। তার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নের ওপর প্রথম আঘাত। সে যেন এখনও মেনে নিতে পারছে না তার স্বপ্নের পরাজয়কে। আগে সে মালা পরাতো শুধু তার দাদুর ছবিতে। কিন্তু এখন মাও সেই দলে চলে গেছে।

এভাবেই মা হারা স্বপ্নিলের দিন কেটে যাচ্ছিল একরকমভাবে। মার কথা ভুলতে না ভুলতেই বাবার অ্যাক্সিডেন্ট। খুব জোরে গাড়িটা চালাচ্ছিল বাবা। হঠাৎই একটা লরির সঙ্গে ধাক্কা। সাথে সাথেই বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। তার জীবনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনাথ হয়ে গেল সে।

তারপর পনেরো বছরের স্ট্রাগল্। তার জীবনে এখন আর কোনো রঙ নেই। সে এখনও স্বপ্ন দেখে। দুমুটো খেয়ে পরে থাকার স্বপ্ন। তার শৈশবের একটা স্বপ্নও পূরণ হয়নি। এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল চলে এসেছিল। হঠাৎই টিং টিং... টিং টং। দরজাটা খুলে দেখে রোহিত, তার সহপাঠী। তাকে একটা চাকরীর সুযোগ দিল। কেরানীর চাকরী কোনোমতো বাকী জীবনটা তার কেটে যাবে।

কয়েক বছর কোনো মতে কাটাতে না কাটতেই সামনে এসে পড়ল আরেক বিপদ। রমেশবাবুর (তার অফিসের বন্ধু) সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। অফিসের মাইনের দিন রমেশবাবু না আসায় মাইনেটা স্বপ্নিল নিজের কাছেই রাখে। পরের দিন টাকাটা রমেশবাবুকে দেওয়ার পর তিনি হিসাব করে দেখলেন এক হাজার টাকা কম। ফলে দোষটা গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। স্বপ্নিলের কাছে এ আরেক স্বপ্ন। সে চুরি করেছে, একথা সে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে চিনতে পারছে না। নিজের কাছে

সে যেন এক অজানা, অচেনা মানুষ। অফিসের সকলের কাছে সে আজ চোর, বিদ্রুপের পাত্র। বড় সাহেবের ঘর থেকে শুরু করে অফিসের ক্যান্টিনের চায়ের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র আলোচনা তাকে নিয়ে। সব প্রমাণ তার বিপক্ষে, সকলে তার বিপক্ষে তাই বড় সাহেবের রায়, 'তোমাকে দু'হাজার টাকা দিতে হবে।' 'চোর'– অপবাদের বোঝা যেন তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সামান্য সম্বল চাকরীটুকুও তাকে এখন খোয়াতে হচ্ছে। এখনও তার কানে বাজছে বড় সাহেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, 'তুমি চোর... তুমি মিথ্যেবাদী,'। কিন্তু সে জানে যে সে চোর নয়। যদি সত্যেরই জয় হয় সর্বদা, তাহলে এখানে কঠোর বাস্তবের কাছে কেন সে পরাজিত, কেন সে মিথ্যেবাদী সারা বিশ্বের কাছে? তার মনে পড়ল তার ছোটোবেলাকার স্বপ্নের কথা, যে স্বপ্নের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই স্বপ্নই তার সঙ্গে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করল। তার মনে হচ্ছিল হাতের কাছে স্বপ্নকে পেলে সে তার... তার... গলাটা টিপে ধরবে, মেরে ফেলবে স্বপ্নকে, মুছে ফেলবে এই দু'অক্ষরের শব্দটাকে তার জীবনের অভিধান থেকে। তার মনে হল এ কাজ করতে গেলে তাকে তার মা-বাবার স্মরণচিহ্নকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে তার পরিচিত উকিলের কাছে চলে গেল। উকিলকে বলল, 'আপনি আমার নামটা বদলে দিতে পারবেন?' একথা বলতে তার ঠোঁট হয়ত একটু কেঁপেছিল। হয়ত তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল দু'এক ফোঁটা জল। কিন্তু তবু সে পিছপা হয়নি। মা-বাবার ভালোবেসে রাখা নাম– স্বপ্নিল বদলে যাচ্ছে আজ... এই মুহূর্তে। এখন থেকে সে নতুন মানুষ। স্বপ্ন তার জীবন ছেড়ে চলে গেল এক্ষুনি। এখন সে মুক্ত। আর কেউ তাকে চোর, মিথ্যেবাদী বলতে পারবে না। সবকিছু তার এখন অনেক ভালো লাগছে।

এখন সে বাড়িতে। সবকিছু কেমন তাড়াতাড়ি বদলে গেল। এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎই তার খেয়াল হল, এত কিছুর পরিবর্তন হলেও তার মনের কোণে এখনও একটু স্বপ্নের রঙ রয়ে গেছে। বেরিয়ে আসবার অদম্য চেষ্টা, কিন্তু পারছে না... পারছে না... পারছে না।

মৃগাঙ্ক মুখোপাধ্যায়

পুজো

পুজো মানেই স্কুলের ছুটি,
অফিস-কলেজ বন্ধ।
পুজো মানেই নতুন জামা,
মনেতে খুশির ছন্দ।
পুজো মানেই বেড়িয়ে আসা,
দিল্লী, মাদ্রাজে...
শরৎকাল শুরু হলেই,
পুজোর গন্ধ ভাসে।
কৈলাশ থেকে দুর্গা আসেন,
এই আশ্বিন মাসে...
তখন বঙ্গ মুখরিত হয়
গ্রামের ঢাকির ঢাকে।
দশমীতে ভাসান হলেই আকুল হয় প্রাণ,
প্রাণ-প্রতিমা আবার আসেন, নিয়ে আমন ধান।



মিথিলা গুহ
বয়স– ১০ বছর

আজ থেকে ২০ বছর পরে

– হ্যালো মা, এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? খুব টায়ার্ড নাকি? আমার প্রশ্ন শুনে মা হাসলেন।

– না, না, আমি ঠিকই আছি। তোর খবর বল্। কোথায় এখন তুই?

– আমি এখন আটলান্টিক শপিং সেন্টারে। দারুণ করেছে জায়গাটা। জানো মা, আমি যে এখন এত বড় একটা মহাসাগরের নিচে মার্কেটিং করছি মনেই হচ্ছে না একদম।

– ওমা, তুই বেড়াচ্ছিস্ বুঝি খুব!

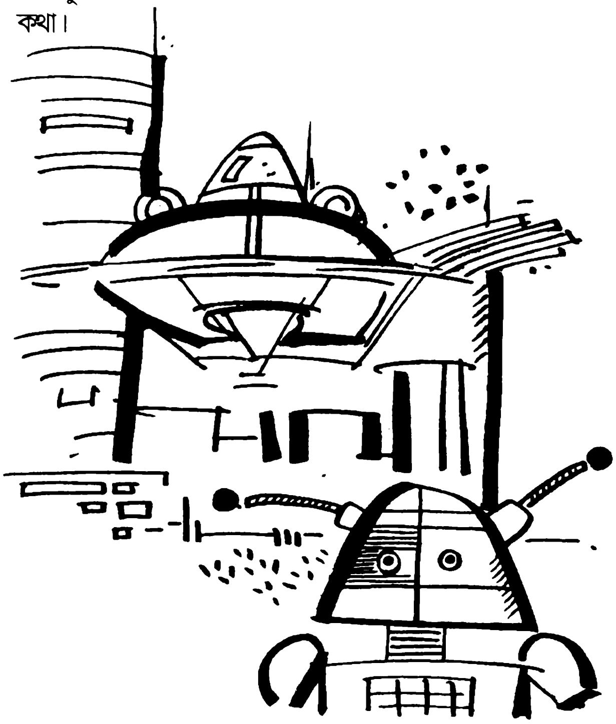
– বারে! আমি এখনও তোমার সেই ছোট্ট মুমু আছি! আমার এখন নিজের একটা এরো কার (১), নিজের দুটো রোবোটোন (২), নিজের একটা বিশাল কম্প হাউস (৩), আর কি চাই তোমার!

মা ভাবলেন, বিশ বছর আগে এসব কল্পনাও করা যেত না। আজ কোথায় আমরা, কোথায় বিশ বছর আগের সেই ছোট্ট মুমু। মা'র সাথে বেশিক্ষণ কথা হল না।

টেলিভিউটা (৪) অফ্ করে দিলাম। মা আবার ফ্রান্স যাচ্ছে এখন। অবশ্য বাংলাদেশ টু ফ্রান্স এখন মাত্র আধঘন্টার ব্যাপার। জেটপ্যাকে (৫) করে জার্নিটাও হয় খুব আরামের। এবার আমার সম্পর্কে বলি–

আমি এখন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করি। আমার তৈরি ফিউচার-কার(৬), যা অতীত বর্তমান ঘুরে আসতে পারে– এখন খুব বিক্রি হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, নামও কুড়িয়েছে খুব।

এই যা! কথা বলতে বলতে দেরিই হয়ে গেল। এরো কারের স্পিড বাড়িয়ে দিলাম আমি, এখন যাব নিউইয়র্কে। বিশ বছর আগে যেখানে দেখার মত খুব সুন্দর একটা মস্ত বিল্ডিং ছিল। 'টুইন টাওয়ার' নামের, সেখানেই এখন আড়াইশ' তলার অফিস বিল্ডিং বানানো হচ্ছে আবার। টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হয়েছিল প্লেনের আঘাতে, তাই এখন এ ব্যাপারে আরও সচেতন হচ্ছেন নির্মাতারা। আমার হেল্পও চেয়েছে ওরা। ওখানে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে কিছু প্রযুক্তি বসাচ্ছি আমি। নিউইয়র্কে কাজ সারতে বেশিক্ষণ লাগল না। রোবোট-টু আর রোবোকম্প-নাইনকে বুঝিয়ে দিলাম কাজগুলো। এবার বাড়ি ফিরব, কত দিন সর্ষে ইলিশ খাইনা। নাকি মা'র কাছ থেকে ঘুরে আসব কিছুক্ষণ। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আগের মত পার্সপোর্ট-ভিসার তেমন ঝামেলা এখন আর নেই। এরো কারেই পাড়ি জমালাম ফ্রান্সে। ফ্রান্সেও এরো-কারের সংখ্যা কম নয়! বিশেষ করে প্যারিসে প্রচুর এরো-কার দেখা যায়। মাতো আমাকে দেখে অবাক। বায়না পূরণ করতেও সময় লাগল না। সর্ষে ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে খেতে মার সাথে কত গল্প জুড়ে দিলাম। মা ফোন করেই বাংলাদেশ থেকে ইলিশ আনিয়েছে আমার জন্য। তাই মাকে স্পেশাল গিফট্ হিসেবে আমার নতুন তৈরি করা রোবোসিং-২২৭টা দিলাম। রোবোসিং খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। মা'র পছন্দের রবীন্দ্র সংগীতের ওস্তাদ রোবোসিং। মাও খুব খুশি তাকে পেয়ে। দু' ঘন্টা মার সাথে কাটালাম। এবার ফিরতে হবে। পুতুল দি'কে (ফ্রান্সে যার বাসায় বেড়াতে এসেছে মা) গুডবাই জানিয়ে গাড়িতে উঠলাম আমি। আবার সেই ব্যস্ততা, কত কত কাজ। হঠাৎ করে মন খারাপ হয়ে গেল– বিশ বছর আগের সেই ছোট্ট মুমুই আমার থেকে আরামে ছিল অনেক। মার কোলে শুয়ে কি মজা করে গল্প শুনত সে। এখন কি আর সে সুযোগ ভাগ্যে জোটে আমার! ভাবাও যায় না তেমন কথা।



গল্পটিতে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দগুলোতে যা বোঝায়–

১) এরো-কার– ভবিষ্যতের একধরনের গাড়ি যা আকাশেও উড়তে পারবে।

২) রোবোটোন– অনেক কাজ একসাথে করতে পারবে এমন শক্তিশালী রোবোট। ভবিষ্যতের এই রোবোটগুলোর দামও খুব বেশি হবে।

৩) কম্প-হাউস– এমন এক ধরনের বাড়ি যার ভেতরের সব কিছুই কম্পিউটারে করা যাবে। যেমন– কম্পিউটারের বাটন টিপে জানালা খোলা ইত্যাদি।

৪) টেলিভিউ– এমন একধরনের টেলিফোন যাতে যে কথা বলবে তার ছবি দেখা যাবে।

৫) জেটপ্যাক– এমন এক ধরনের বাস যা খুব দ্রুত আকাশে উড়তে পারবে।

৬) ফিউচার কার– একধরনের গাড়ি যা টাইম মেশিনের মত অতীত বর্তমান ঘুরে আসতে পারবে।

৭) রোবোসিং-২২৭– বিশেষ ধরনের রোবোট যা খুব ভালো গান গাইতে পারবে।

সাগরিকা রায়

পনেরো নম্বর

চোদ্দ নম্বর মাস্টারমশাই বিদায় নেওয়ার পর, বড়সড় লাঠি খুঁজলেন গণপতিবাবু। কাঁঠালগাছ আছে খান সতেরো, তা থেকে একখানা মজবুত লাঠি হতে পারে না? পারে বৈকি! ছোকরা চাকর জগদীশ দাঁত বের করল, যেন তাসের আসর বসেছে মুখের ভেতর। তরতরিয়ে উঠল গিয়ে গাছে। দা-এর এককোপে নামিয়ে আনলো একখানা জব্বর ডাল। এবার ঝাড়াই-বাছাই করে, চেঁচেপুঁছে... আহা হা, কেমন সুন্দর বেত! হাতের সুখ করে নেওয়া যাবে হে গণপতি! নিজেকেই শুনিয়ে দিলেন গণপতিবাবু। আর নয়, এবার আসরে নামতে হবে নিজেকেই।

আসামী দুজন তখন ঘুঘুমালী ছাড়িয়ে কোথায় এক নদী আছে, তারই খোঁজে বেরিয়েছে। নাওয়া-খাওয়া নেই, পড়াশোনার পর্বে আজ থেকে শান্তি-পর্বের শুরু। পনেরো নম্বর মাস্টারমশাই আসতে না হোক সাতদিন তো লাগবেই। ততক্ষণ চলুক নানান ব্যস্ততা। পড়াশোনা ছাড়াও তো কত কাজ রয়েছে! সেসব কি আর ওদের বাবা বোঝেন?

ডাঁসা পেয়ারায় কামড় বসিয়ে বাচ্চু মাথা নাড়ে– 'আজ কিন্তু... মুশকিল আছে ভাই!'

– 'বাবা? দূর! বাবা জানতেই পারবে না। যে নালিশ করবে দেব তার মাথায় গোবর ছুঁড়ে!' দৃশ্যটা কল্পনা করে তপুর হাসি থামতেই চায় না। সুতরাং সংক্রামক হাসিতে বাচ্চু-ও কাত। ওদের হাসির শব্দেই বোধহয় ভয় পেয়ে উড়ে গেল কাকটা।

গণপতিবাবু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। লাঠিখানা হাতেই ছিল। জগদীশ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল মজা দেখবে বলে। দশদিন হল ও এসেছে এ বাড়িতে, দিন আটেক তো ওকে ঘুমুতেই দিল না বিচ্ছুদুটো। মাঝরাতে ভয় দেখাবে, পা ধরে টেনে নামিয়ে দেবে চৌকি থেকে! কম ঝামেলা করে? আজ চক্ষু সার্থক হবে!



পিসিমা দুবার উঁকি মেরে গেলেন। গণপতি যা রেগেছে, আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই। তা, একটু শাসনও দরকার। বাপরে বাপ! পড়াশোনার নাম নেই, জ্বালিয়ে খাচ্ছে সারাক্ষণ! এইমাত্র হরিনামের মালাখানা রেখে পিছু ফিরেছেন, পরমুহূর্তে দেখো মালা ঝুলছে আমলকি গাছের ডালে! নাকি কাক নিয়ে গেছে! সহ্য হয়? শুধু এই? অতো সাধ করে লাউঘন্ট করলেন সেদিন, ওমা, খেতে বসে তার ভেতরে গুচ্ছের চিংড়ি পেয়ে কী অবস্থাটা হল? রাম, রাম! কী বলবেন? চেঁচামেচি করাতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছোঁড়াদুটো 'কীরকম মজা করেছি? আমাদের দোষ নেই, গোপাল ভাঁড় শিখিয়েছে গো!' বলে সে কি হাসি!... করুক শাসন। দু ঘা পড়লে তবে যদি...।

চুল বাঁধা হয়ে গেছিল। জবা-ও একবার দেখে গেল। মাগো, কি বিরাট লাঠি! একদৌড়ে সে তখন মনিবগিন্নীর কাছে– 'মাসিমাগো, কত বড় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেসো! ওরা মরে যাবে যে!'

গম্ভীরমুখে পান সাজছিল ছোঁড়াদুটোর মা। মারবে মারো, কিন্তু এখনও আসছে না, গেল কোথায় সে খোঁজটা তো করা চাই! রাত হয়েছে। শীতকালের রাত, ছটা বাজতেই ঘোর আঁধার। দরজার মুখে লাঠি হাতে দাঁড়ানো দেখলে কি বাড়িতে ঢোকার সাহস পাবে?

– 'তা হলে?' জবা উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না, 'তা হলে কী হবে গো? ওরা কি পথে পথে ঘুরবে নাকি? আহারে, এত ঠান্ডায়...!' দৃশ্যটা ভাবতে কষ্ট হয় জবার, তবু, একটু খুশিও কি হয় না? চুল বাঁধার ফিতে, তেল, জামাকাপড়, নোংরার মধ্যে কারা যে ফেলে রাখে, তা কি ওর অজানা? বাবুর

ছেলে বলে কিছুটি বলতে পারে না। হোক না একটু ঠান্ডা! বাড় বেড়েছে খুব।

রাত যতো বাড়ে, গণপতিবাবুর রাগ তত কমে। হবে না? সাতটার মধ্যে রমেশ সা-র বাড়িতে তাসের আড্ডা শুরু হয়। সুতরাং দরজার কোণে লাঠি থাকলো সোজা হয়ে, গণপতি বের হলেন।

জগদীশ মনখারাপ করে ভেতরে গেল। পিসিমা-ও হতাশ হলেন। জবা উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল বার ছয়েক– ওরা এসেছে কি?

না, আসবে কি? সামনে দিয়ে ঢোকাটা সম্ভব নয়। গণপতিবাবুর বিরাট চেহারার পাশে ওই বিরাট লাঠিখানা ওদেরও চোখে পড়েছে। সামনে আসবে কী করে? তাই বলে সারারাত ছেলেদুটো বাড়ির বাইরে থাকবে?

তা কি থাকে? গোয়ালে গরুগুলো উসখুস করাতে ওদের মা যা বোঝার বুঝে ফেললেন। লন্ঠন হাতে জবাকে নিয়ে গোয়ালে গেলেন। টেনে দুই হতচ্ছাড়াকে বের করে আনলেন। হাত-পা ধুইয়ে দিতে যেতেই এমন ঝটকা দিল, হাত থেকে লন্ঠন পড়ে...! মারবেন কাকে? শয়তান দুটো অন্ধকারের মধ্যেই একছুটে নিজেদের ঘরে ঢুকে দোর দিয়ে দিয়েছে না?

॥ ২ ॥

পাখ-পাখালি ডাকেনি, তারই মধ্যে উঠে বার চব্বিশ ডন-বৈঠক দেওয়া গণপতিবাবুর অভ্যেস। উদাত্ত কণ্ঠে দেশভক্তির গান গাওয়াটাও এরই মধ্যে পড়ে। শরীর এবং মন এ দুই হল মন্দির। এ দুটোকে ঝাড়াই-পোছাই করা হল সবচেয়ে বড় কাজ। আর, তার জন্য চাই নির্জন স্থান, পবিত্র সময়। আজকাল আর নির্জনতা কোথায়? সর্বত্র তো মানুষে মানুষে ছয়লাপ। আর ভোর ছাড়া পবিত্র সময় বা কোথায়? এ সময় নিজের সঙ্গে কথা বলতে হয়। তুমি কী কী খারাপ কাজ করেছ, ক'টা মিথ্যে বলেছ– সব চিন্তা কর। এরপর ঠিক কর, আজ তুমি কী কী ভাল কাজ করবে– এই ভাবে ভাবো, ভগবান এ সময় তোমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে সব কথার জবাব দেবেন। কথা বল তাঁর সঙ্গে। গণপতিবাবু ছাদে ঘুরে ঘুরে একা একা কথা বলেন। ছেলেদুটো বখে গেল! কিছু শেখাতে পারলেন না। বাঁদরদুটো কথাই যে শুনলো না তাঁর। পড়াশোনা-ও হবে বলে মনে হয় না। এতগুলো মাস্টারকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ল। মাস্টাররা সব হাসিমুখে আসে, গম্ভীরমুখে যায়। কেউ বা গম্ভীরমুখে আসে, কাঁদো কাঁদো মুখে চলে যায়। দেখে শুনে জবরদস্ত মাস্টার এনেছিলেন এবার, সেও গেল!

সাহসা কী এক নব উন্মাদনায় ভেসে গেলেন গণপতিবাবু। এত করেও ছেলেদুটো মানুষ হল না? নাঃ, আজ একটা হেস্তনেস্ত না করে... তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন, উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জোরগলায় ডাকলেন 'তপু... বাচ্চু!'

বাবার গলার স্বর পেয়ে লেপের ভেতর ওরা তখন ঘেমে যাচ্ছে। বাবা? ভুলে যায়নি? লাঠিটা?

ভুলতে দেবে জগদীশ? দাঁত বের করে এসে খবর দিল– 'ওঠ, ডাকছে বাবু!' আবার, বাবুর কাছে গিয়ে জানতে চাইল-– 'লাঠি আনবো?'

উঠোনের মাঝে দুটো বিচ্ছু ভালোমানুষের মতো মুখ করে কাঁপছে তখন। পিসিমা ফুল তুলতে তুলতে– 'আজ আর বেশি মারিস না' বলাতেও গণপতি তোয়াক্কা করলেন না। ভাঁটার মতো বড় বড় চোখদুটো একবার বাচ্চুর দিকে, একবার তপুর দিকে ফিরলো। এক হাতে যেই বাচ্চুর কান ধরেছেন, অন্য হাতে বাতাস কেটে এগিয়ে গেল লাঠি...!

সে মার কতক্ষণ চলতো কে জানে। গণপতিকে যেন অসুর ভর করেছিল। ভয়ে, ত্রাসে কাঁদতে ভুলে গেছিল ছেলেদুটো। এমন সময়... কে যেন... সজোরে কেড়ে নিল বেতখানা! গণপতিবাবু ঘুরে দাঁড়িয়েও অমন রাগের মুহূর্তেও অবাক হলেন কে এ?

ভারী তিরতিরে সুন্দর চেহারা শ্যামলা ছেলেটি, খালি গা, কোমরে একখানা তোয়ালে জড়ানো, গণপতিবাবুর হাত থেকে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে।

তারপর বিচ্ছুদুটো এ যাবৎ যা দেখেনি তাই দেখল এবার। দু হাত দিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল ছেলেটি– 'আর কত মারবেন?'

– 'কে তুমি? চিনলাম না!'

– 'আমি চিনি বাবু! সামনের বাড়িতে এসেছেন! দশদিন হল!' জগদীশ এগিয়ে আসে।

– 'আমি সুজন দত্ত। ঐ যে ছাদ দেখা যাচ্ছে, ওটা আমার দিদির বাড়ি। রোজ সকালে ছাদে যোগব্যায়াম করি। আজ দেখলাম এই কান্ড! তাই...!'

চমক লাগল গণপতির। যোগব্যায়াম? বাঃ! বেশতো ছেলেটি।

– 'তা আপনি করেন কি? মানে, কী পড়েন টড়েন, এই আর কি!' ছেলেটাকে 'আপনি' সম্বোধন করতে অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু, হঠাৎ পরিচয়ে 'তুমি' বলতেও অসুবিধে হচ্ছিল যে!

– 'পড়িনা। মানে পড়াই! একটা কলেজে ইকনমিক্স পড়াই।' হাসে ছেলেটি।

– 'বাঃ বাঃ!' মুখ ফুটে 'বাঃ' শব্দটা দুবার বেরিয়ে এল– 'এই না হলে ছেলে! আর আমার দুটো হল...!'

– 'কেন? বেশ ভালো ছেলে বলেই তো মনে হচ্ছে!' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের দেখে সুজন দত্ত।

– 'কী দেখে মনে হল?' গণপতি কি আবার রেগে যাবেন?

– 'ওদের পকেটে দুটো গুলতি দেখছি... অর্থাৎ ওদের নিশানা ভালো নিশ্চয়... এটা দারুন গুণ! তাছাড়া, পায়ের একটা নখ উঠে আছে এর, নুনছালও উঠেছে... দুজনেরই... অর্থাৎ প্রাণশক্তি রয়েছে। অর্থাৎ...'

– 'অর্থাৎ'? মুখ থেকে কথা কেড়ে নেন গণপতি।

– 'অর্থাৎ ওরা মিনমিনে আধমরা ছেলে নয়। এমন ছেলেই তো আমাদের দেশে দরকার। বিবেকানন্দ কী বলেছেন?'

'ভালো হতে না পারিস, খারাপ হ। তবু অলস, কর্মহীন হয়ে থাকিস না।'

– 'একঘন্টা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে তারপর এসব বললে হতো না?'

– 'এক ঘন্টা? কেন?'

– 'গতকাল চোদ্দ নম্বর মাস্টারকে তাড়িয়েছে ওরা তা জানেন? কেউ টিকে থাকতে পারছে না মশাই!'

– 'তবে তো মজা বাড়ল। আমি যদি পনেরো নম্বর হই, তাহলে কি আপত্তি আছে আপনার? আমার এখন দিনকুড়ি ছুটি আছে!' কী বলবেন গণপতি? এ তো আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। এখন টেকে কতক্ষণ তাই হল গিয়ে কথা!

অবশেষে পনেরো নম্বর এল। হাসিমুখেই এল। প্রথমদিন

ঘরে ঢুকেই 'বাঃ, বেশ তো ঘরখানা তোদের! আয়, ডিগবাজি খাই।' বলে মাস্টারমশাই যখন মজাদার ডিগবাজি খাচ্ছেন, বাচ্চু, তপু তো হাঁ।

'পড়বো না স্যার?' ভয়ে ভয়ে মুখ খোলে তপু।

'ধুর। আয়, আগে খেলি!'

বাচ্চু ইশারায় মাথা দেখায় তপুকে। অর্থাৎ, নির্ঘাৎ মাথার গন্ডগোল। নাহলে...।

তিনজনে মিলে বিছানা টেনে নামাল খাট থেকে। তারপর বাচ্চু-তপুও স্যারের মতন ডিগবাজি খেতে শুরু করল। স্যার একটা সময় অদ্ভুত এক ভঙ্গিমায় শুলেন।

– 'এটা কী বলতো?'

– 'আমিও করবো স্যার।' বাচ্চু স্যারের ভঙ্গিতে পা দুটো উঁচু করে শোয়।

– 'এবার পা দুটো নামিয়ে... বেশ, এটা হল হলাসন্। এটা চক্রাসন।' মজার সার্কাস যেন। ভারী মজা পেল বিচ্ছু দুটো। মিনিট পনেরো এমনধারা খেলে স্যার শুয়ে পড়লেন শরীর ছেড়ে দিয়ে– 'এবার শবাসন! একদম মড়ার মতন!'

– 'শোন! আজ আর পড়াটড়া নয়। বরং একটা গল্প বলি।'

– 'সুপারম্যানের?'

– 'সুপারম্যান? তো বলতে পারিস। তাঁকে সুপারম্যান বলতেই হয়। শোন তবে...।'

তাসের আসর শেষ হতে হতে সাড়ে নটা বেজে যায় রোজ। গণপতিবাবু বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্য টের পেলেন। অন্যদিন এ সময়ে ছেলেদুটোর হৈ হুল্লোড়। পিসিমার চ্যাঁচমেচি, জগদীশের তড়পানি– সব মিলিয়ে পাঁচমিশেলি আওয়াজে বাড়ি ভরে থাকে। কিন্তু আজ... ছোঁড়াদুটো বাড়ি নেই নাকি? মাস্টারকে কি প্রথমদিনেই তাড়ালো?

ওদের পড়ার ঘরের ভেতর থেকে কার গলা পাওয়া যাচ্ছে- - 'উনি হলেন নেতাজি! এতক্ষণ যা বল্লাম তাতে তাঁকে কি সুপারম্যান বলবি না?'

অদ্ভুত! মাস্টারের হাতে তো লাঠি নেই। বকাঝকা নেই! ছেলেদুটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো কী গিলছে?

'কাল কি পড়তে হবে স্যার?' কৌতূহলী তপু।

'নাঃ! দ্যাখ না কাল কী করি।'

তিনজনে মিলে ফের বিছানা গুছোয়, টেবিল গুছোয়। ছাদের সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে গণপতিবাবু দেখলেন মাস্টার চলে যাচ্ছে। গলায় এক অদ্ভুত সুর খেলছে। কান পেতেও গণপতিবাবু গানটা বুঝতে পারলেন না।

॥ ৩ ॥

সাতটা দিন কাটলো? নাকি সাতটা বছর? এত নীরব শান্ত বাড়িতে কবে কাটিয়েছেন গণপতি? জগদীশ সন্ধেবেলায় নিষ্কর্মা হয়ে ঘুমোয়, জবা ওদের মায়ের কাছে নিমকি বেলতে শেখে, পিসিমার গোপালের জন্য সাটিনের জামা বানান। এত নির্বিঘ্নে কবে কাজ করতে পেরেছে ওরা? বিচ্ছুদুটো কি বাড়িতে নেই?

আছে বৈকি। তবে ওদের সময় কোথায়? দুপুরে স্যারকে ঘুড়ি বানানো শেখাতে হয়। বিকেলে তিনজনে মিলে গুলতির টিপ আরও নিপুণ করতে শেখে। অর্জুনের মতো হতে হবে যে। আর, এরই মাঝে চলে বকবকানি। কম কথা নাকি? এতদিন ধরে পড়া তো আর কম জমেনি। গুলতির টিপ ঐ তালগাছে পৌঁছলে দারুণ জিনিস শেখাবেন স্যার। ওমা, এটা আবার ব্যাপার নাকি? স্যার খুশি হয়ে একটা মজার ব্যাপার শেখালেন। টেনস্ এত কঠিন লাগতো কেন আগে? জ্যামিতি বইটাকে পুচির বাক্স থেকে বের করে স্যার ওদের জ্যামিতি শেখাচ্ছেন।

ভোর চারটের মধ্যে কারা যেন ছাদে লাফালাফি করে। গণপতি প্রথমদিন চমকে গেছিলেন। বিচ্ছুদুটো এসময়ে ছাদে কেন? ওঃ! ওরা যোগব্যায়াম করছে।

॥ ৪ ॥

বিছানাপত্র গুছিয়ে রাখছিল তপু। আর বাচ্চু টেবিল। নিজেদের কাজ তো নিজেদেরই করতে হয়। খাতাগুলোতে আজ সুন্দর করে মলাট দিয়েছে ওরা। খাতা আর বই গুছিয়ে রাখতে রাখতে বাচ্চু অন্যমন হয়ে পড়ছিল। ঘড়ি দেখতে গিয়ে চমকাল– তিনটে? আর তো মাত্র... ? বাইরে দুটো গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। পায়ের শব্দ এসে ওদের ঘরের সামনে থমকাল। ভারি নরম সুরে কে ডাকল– 'বাচ্চু? তপু!' বাবার গলা এত নরম? উত্তর না পেয়ে স্যার ডাকলেন– 'তপু, বাচ্চু! কী হল? ওরা বাড়িতে নেই?'

কোথায় যাবে এই ভরদুপুরে? তবে? সাড়া দেয় না কেন?

কার যেন হাতের ছোঁয়া পিঠের ওপর! তবু তাকাল না তপু! 'তপু! বাচ্চু!' স্যার এত নরম সুরে ডাকছেন!

গণপতিবাবু ব্যাপার বুঝতে পারছিলেন না। কী হচ্ছে ঘরের ভেতরে? কী করছে ওরা?

দ্যাখো কাণ্ড। স্যারকে জড়িয়ে কাঁদছে দ্যাখো।

– 'ওরে ছাড়! কাঁদিস কেন? স্যার তো যাবেন পাঁচটার গাড়িতে, এখনই কান্নাকাটি কিসের?'

– 'কাঁদতে দিন ওদের। সব দোষ ভেসে গিয়ে গুণী হয়ে উঠেছে ওরা। কাঁদুক। আমি নেক্সট ছুটিতে আসছি। তবে যা বলেছি মনে রাখবি। প্রথমে যোগব্যায়াম। তারপর কিছু খেয়ে পড়তে বসা।...!'

– 'কবে আসবেন স্যার?' তপু কান্না গিলতে পারে না।

– 'ওঃ! আসবো তো! এখানকার কলেজে ট্রান্সফার হয়ে আসবো তো! কদিন পরেই!'

সত্যি?

সত্যি বটে। মফস্বল অঞ্চলে পড়াতে চেয়েছিলেন। এখানকার ছাত্রেরা ভাল সুযোগ পেলে ভাল ফল করতে পারে, এত দেখেছে সবাই। তাই ওদের পড়াতে ইচ্ছে খুব...। দিদির বাড়িটা উপলক্ষ্য, কলেজে ঘুরে গেলেন এইফাঁকে।

হাসেন গণপতি। আর চিন্তা কি? ওরে জগদীশ, লাঠিটা দে!

'লাঠি কী হবে?'

'আমার সন্ধেবেলায় তাসের আসরে যাওয়ার একটা অবলম্বন চাই তো!' হাঃ হাঃ করে হাসেন গণপতি।

'কিন্তু তাস কেন? বরং দাবা খেলুন। একাগ্রতা বাড়ে, মাথা পরিষ্কার রাখে। বুদ্ধির বিকাশ হয়।'

চমকে ওঠেন গণপতি। ছেলেটার বুদ্ধি আছে! এককালে কত দাবা খেলেছেন। ভালো দাবাড়ু ছিলেন তিনি। দাবার কথাটা মন্দ নয়! কালই একটা দাবার কোট কিনে আনতে হবে! সেই সঙ্গে বাচ্চু-তপুকে শিখিয়ে নিলে...! ছেলেটা মন্দ বলেনি!

নাঃ! পনেরো নম্বর তো মহা গোলমেলে!

তপনকুমার দাস

পিকপিকে সিং

পিকপিকে সিং-এর লিকপিকে হাত।

ধুস! হাত নাকি? কাঠির লাঠি। হাত কি অমন সরু হয়? দড়ির মতো?

মোটেও দড়ির মতো না। ফোঁস করে তুতাই। উদাহরণ না দিতে পারলে দিবি না। ওই জন্যই তো বাংলায় কম নম্বর পাস।

তোর যেমন বুদ্ধি। দড়ি কি মোটা হয় কখনো! বাংলার নম্বর নিয়ে খোঁটা একদম পছন্দ হয় না। দড়ি কখনো টান টান থাকে? ঝুলঝুল ঝোলে।

তাই তো! পিকপিকে সিং-এর হাত কি ঝুলঝুল ঝোলে? লিকপিকে হলেও বেশ টানটান থাকে শুনেছে। হাত তো টানটান থাকবেই। হাড়ের মাঞ্জা দেওয়া আছে না।

শোন কথা! ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে মাথাটা একদম গেছে। সুতোয় কাচ গুঁড়োর মাঞ্জা– চলতে পারে। হাতে আবার হাড়ের মাঞ্জা হয় নাকি? মাস্টারমশাইয়ের মতো চোখ পাকায় বুবান।

হয় না আবার? দেখ তো, দেখ। টিপে দেখ। এটা কি? হাড় না কাচ গুঁড়ো? নিজের বাঁ হাত ঝাঁকিয়ে মেলে ধরে তুতাই। ডান হাতে টিপে টিপে গোল্লা চোখে জোর ধমকে দেয় বুবানকে।

ওটা তো কঙ্কালের হাড়। মানুষের শরীরে থাকে।

তোর মুন্ডু। কঙ্কাল থাকে যাদুঘরে। আর আছে ছোট মামার কাছে সত্যিকারের হাড়ের কঙ্কাল।

যাঃ। গুল দিস নে।

সত্যি বলছি। পোষা কঙ্কাল। একটুও ভয় দেখায় না। ছোটমামা হাত খুলে দেয়। পা খুলে দেয়। আবার বেঁধেও দেয় তারের দড়ি দিয়ে। ছোটমামার গর্বে বুক ফুলে যায় তুতাইয়ের।

নে ধর। এতক্ষণ বসে মন দিয়ে আঁকা ছবিটা সামনে মেলে ধরে ছোট্টু। ওর স্বভাবটাই অমন। কিছু শুনলেই হলো। খাতা টেনে এঁকে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে। সেই জন্যেই বোধ হয় ওর ভালো নাম অঙ্কন।

কী? না দেখেই জানতে চায় বুবান।

পিকপিকে সিং।

পিকপিকে সিং? না হাবিজাবি ডিম? হিজিবিজবিজ নয় তো? ছবিটা একটুও পছন্দ হয়নি তুতাইয়ের।

কই দেখি? আঙুল দুটো চিলের ঠোঁটের মতো বেঁকিয়ে ছোট্টুর হাত থকে ছবিটা তুলে নেয় বুবান। মাথা নাচিয়ে তারিফ করে– বাঃ ভারি সুন্দর একটা আজেবাজে ব্যাঙ এঁকেছিস তো!

পিকপিকে সিংকে তো চোখে দেখিসনি। তাই অমন আবোল তাবোল বলছিস। একটুও রাগ করে না ছোট্টু। কারণ সে পিকপিকে সিং-কে দেখেছে। ছোটকাকার হাত ধরে ভুটো দাদা আর মামন দিদির সঙ্গে। গত বছর।

বুবান আর তুতাই গতবছর ছিলো না। বেড়াতে গেছিলো কোথায় যেন। ওঃ হ্যাঁ! অরাকুতে। তবে পিকপিকে সিং-এর গল্প শুনেছে বহুবার। ছোটকাকার কাছে। ভুটো দাদা মামন দিদি আর ছোট্টুর কাছে। বছরে মোটে এই কটা দিন। ভাই ফোঁটার আগের আর পরের দিন। তুতাই, বুবান, ছোট্টু, মামন আর ভুটোর যেমন খুশি করার দিন। হৈ হৈ রৈ রৈ দুষ্টুমি গাছে চড়া ঘুড়ি ওড়ানো টার‍্যা র‍্যা র‍্যা বন্দুক কাঁধে টারজান কিংবা স্পাইডার ম্যান সাজার দিন। মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, জ্যাঠা-বম্মা, ঠাম্মা-দাদু কেউ তখন ওদের দিকে ফিরেও তাকায় না। শুধু খাওয়া আর রাতে শোওয়া ছাড়া। বাকি সময় শুধু ছোটকাকা। গল্প বলা, মজা নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, ফুচকা আলুকাবলি কিনে দেওয়া সব– সব কিছুই ছোটকাকার জিম্মায়। ছোটকাকা এই ক'দিন আর কাকা থাকে না– বন্ধু হয়ে যায়।

কি যেন বলছিলি কঙ্কালের কথা? বুবানের হাত থেকে ছবির কাগজটা টেনে নেয় ছোট্টু। দে এঁকে দিচ্ছি।

কঙ্কাল আঁকবি তুই? অবাক না হয়ে পারে না তুতাই।

আঁক দেখি, কেমন পারিস! চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় বুবান।

তার চেয়ে বরং একটা পাখি আঁক। ফুল আঁক।

ঘর বাড়ি নদী, পাহাড় যা খুশি আঁক। কঙ্কাল আঁকতে যাস নে। পরামর্শ দেয় তুতাই। তার ছোটমামা ছাড়া কঙ্কাল কি কেউ আঁকতে পারে? তাও আবার ওই পুচকেটা। বিশ্বাসই হয় না।

একটুও প্রতিবাদ করে না ছোট্টু। ছবি আঁকা শুরু করলে সে কথা বলে না। কারো কথা কানেও শোনে না।

ভাই তুই ভূত দেখেছিস? হঠাৎ জানতে চায় বুবান।

না। ছোট্ট উত্তর তুতাইয়ের।

ভূত দেখতে কঙ্কালের মতো।

ওমা। তাই নাকি? অবাক বুবানের চোখ দুটো পাতিলেবুর মতো গোল হয়ে যায়।

মোটেও না। ভূত দেখতে পিকপিকে সিং-এর মতো। ছবির খাতায় পেনসিল বুলিয়ে জবাব দেয় ছোট্টু। ছোটকাকা বলেছে রাতের বেলায় পিকপিকে সিং-এর ভয়ে চোর পালায়।

সে কি? ছবি আঁকতে আঁকতে কথা বলা! ভারি অবাক হয় তুতাই আর বুবান। এমন তো কখনো হয়নি।

যারা ছবি আঁকে তারা একটু খ্যাপাটে হয়– তাই না রে দিদিভাই। মামন এসে সামনে দাড়াতেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় তুতাই।

ধুস! আমিও তো ছবি আঁকি। আমি কি খ্যাপাটে? মামন কিছু বলার আগেই প্রতিবাদ করে ভুটো। মামন আর ভুটো। কাকিমা বলে পিঠোপিঠি। জোঁকের মতো। সব সময় একসঙ্গে। স্কুলে। বাড়িতে। নবস্যারের কাছে। সব সময়।

যা! যা! বকিস নে? যা ছবি আঁকিস? আমি ঠিকঠাক করে দিই তাই। নইলে ড্রইংয়ে তিরিশও পেতিস না। সত্যি কথাটা ফাঁস করে দেয় মামন। ভুটো আর কি বলবে? কথার পিঠে কথার কিল মারতে পারতো ঠিকই কিন্তু এখন হজম করে নিলো। এর পর যদি বলে বসে পাঁচ আর সাত যোগ করে তো

তুই এগার লিখিস। তখন কি আর মান সম্মান থাকবে?

কি রে দিদিভাই! বললি না তো? আবার তাগাদা দেয় তুতাই।

কী?

ওই যে আঁকিয়েদের মগজের কথা। মনে করিয়ে দেয় তুতাই।

আঁকিয়েদের মগজে ছবি গিজ গিজ করে তো তাই ওরা একটু উদাস উদাস। আপন ভোলা। স্বপন দোলায় দোলে। হাত নাচিয়ে চোখ পাকিয়ে বুঝিয়ে দেয় মামন। বড়োরা যেমন করে বোঝায়– ঠিক তেমনি।

তা করুক ক্ষতি নেই। কিন্তু ভূত দেখতে যদি পিকপিকে সিং-এর মতো হয় তাহলে পিকপিকে সিং-ও ভূত।

ঠিক! ঠিক! বুবানের সমর্থন পায় তুতাই।

আর চোরের যদি ভূতের ভয় থাকে–

তাহলে কি আর রাতে চুরি করতে যায়?

তুতাইয়ের কথা কেড়ে নিজের মুখে বলে দেয় ভুটো।

কি রে ছোট্টু! বল কি বলবি! তুতাইয়ের যুক্তির উত্তর খুঁজে না পেয়ে তুতাইয়ের কোর্টেই বল ঠেলে দেয় মামন।

নে। দেখ।

কী? আঁৎকে ওঠে ভুটো।

কই দেখি। হাত মেলে দেয় মামন।

কঙ্কালের ছবি। পিকপিকে সিং-এর ছবিও বলতে পারিস কিংবা ভূতের।

না। বলতে পারি না। তেড়ে প্রতিবাদ করে মামন– বরং এই ছবিটাকে জঞ্জালের ছবি বললেও ভুল বলা হবে।

কেন? কেন? অবাক হয় ছোট্টু।

ঘাস জঙ্গলের মধ্যে অমন খুন খুনে শুকনো গাছ জঞ্জাল নয় তো কি? নিজের কথার ঘাড়ে নিজেই চেপে বসে থাকে মামন।

ঠিক বলেছে দিদিভাই। সমর্থন করে ভুটো, তুতাই আর বুবান– ঠিক বলেছে! ঠিক বলেছে।

যাঃ। যাঃ। ছবির কিছু বুঝিস্। রাগ না করে ফিক ফিক হেসে ফেলে ছোট্টু। পাতা গজানোর আগে গাছে শুধু ডালপালা থাকে কি না বল।

থাকে! তো? বুঝে নিতে চায় ভুটো।

তেমনি মাংস আর চামড়ার আগে থাকে কঙ্কাল। ঠিক এমনি। পিকপিকে সিং-এর মতো। জলের চেয়েও সোজা ভাষায় বুঝিয়ে দেয় ছোট্টু।

ছাড়, ছাড়! ব্যাঙের মাথা ছবির কথা। রাগে গরগর করে তুতাই– দিদিভাই, তুই দেখেছিস?

কী রে?

পিকপিকে সিং-কে?

দেখিনি আবার। চোখদুটো ফুলে ওঠে মামনের। দেখে তো আমি থ। কী সাহস রে বাবা। একা একা ঠায় দাড়িয়ে থাকে। ভয়ডর নেই একটুও।

তুই কথা বলেছিস পিকপিকে সিং-এর সঙ্গে? উৎসাহে টলমল করে জানতে চায় বুবান।

না বাবা, না!

দিদিভাই তো ভয়ে একেবারে কাঠ। ছোটকাকাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না। যদি দেখতিস– হাঁড়ি ভেঙে দেয় ভুটো।

মোটেও না। আমি মোটেও কাঁদিনি। তোকে ভয় দেখানোর জন্যেই তো...।

না, ভয় দেখানো চলবে না। ভয় খাওয়াও চলবে না। ভয় নিয়ে বরং খেলা করতে পারো। লোফালুফি খেলা। বলতে বলতে আসরের ঠিক মাঝখানে এসে হাজির হয় ছোটকাকা। জানতে চায়– কে কাকে ভয় দেখাচ্ছে?

না, ওই পিকপিকে সিং-এর কথা...।

পিকপিকে সিং? ওঃ। সে তো আফ্রিকার জঙ্গলে ছিলো শুনেছি।

আহ্! ছোটকাকা? তোমার স্মৃতি দেখছি গুলিয়ে ঘোল হয়ে গেছে। হাততালি দেয় ভুটো। গতবছর নদীর চরায়...।

হ্যাঁ! হ্যাঁ মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। মাথা দুলিয়ে খুশির বন্যায় উবছে পড়ে ছোটকাকা। চরডাঙার পিকপিকে সিং? তাই তো?

তবে যে বলছো আফ্রিকার জঙ্গল? অবাক হয় তুতাই। মুখে কিছু না বললেও অবাক হবার সব চিহ্ন ভেসে বেড়ায় বুবানের চোখে।

আমরা পিকপিকে সিং-কে দেখবো। বায়না ধরে তুতাই।

আমাদের দেখাও না। ও, ছোটকাকা! বায়নায় বুবান ছাড়িয়ে যায় তুতাইকে।

না, বাপু না! অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে পিকপিকে সিং-এর কাছে যেতে পারবো না। সাফ জানিয়ে দেয় ছোটকাকা।

কী! মিললো তো? যারা ছবি আঁকে তারা কখনো মিথ্যে বলে না। আনন্দে ধেই ধেই নেচে ওঠে ছোট্টু।

যা বাব্বা! কী মিললো? ছোট্টুর নাচ দেখে একটুও খুশি হয় না বুবান।

ওই যে বলেছিলাম ভূতের কথা– পিকপিকে সিং-এর কথা।

তো? তুতাইয়ের ছানাবড়ার চোখে জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

পিকপিকে সিং নিশ্চয়ই ভূতের জ্যাঠা! নইলে ছোটকাকা ভয় পাবে কেন? পাল্টা প্রশ্ন করে ছোট্টু।



তুই আমাদের ঠকিয়েছিস! মিথ্যে মিথ্যে গল্প বলেছিস? ছোট্টুকে চেপে ধরে বুবান।

মোটেও না। কী ছোটকাকা, আমি পিকপিকে সিং-কে দেখিনি? দোদমার মতো দুম দাম ফেটে পড়ে ছোট্টু।

চোখ বুজে অমন অনেককিছু দেখা যায়– জানিয়ে দেয় ছোটকাকা।

মানে? ছোট্টুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাসে জানতে চায় তুতাই আর বুবান।

মামন ভয় পেলে ছোট্টু আর ভুটো কি চোখ খুলে রাখতে পারে? রহস্যের গন্ধ ছড়িয়ে দেয় ছোটকাকা।

চলো তো ঘুরেই আমি

পিকপিকে সিং-এর বাড়ি থেকে। কাঁধে ইয়া বড়ো রাইফেল ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ায় বুবান। এক ঝটকায় ট্রিগারে হাত রেখে ছড়িয়ে দেয় ট্যারা র‍্যাঁ র‍্যাঁ গুলির শব্দ। রাইফেলের মাথায় আগুনের মতো ঝলসে ওঠে ব্যাটারী পোড়ানো আলো।

চলো! বুবানের পাশে দাঁড়ায় তুতাই।

আমি আর যাবো না। গত বছর তো দেখেছি। এ বছর থাক। আগামী বছর যাবো। ইনিয়ে বিনিয়ে অজুহাত বুনে দেয় মামন।

এমা! ভীতু! ভীতু! বুবান আর তুতাই গান শোনায় ক্যারাওকের মতো।

মোটেও না। আমার মাথা ধরেছে, আমি যাবো না। ঠাম্মা, ঠাম্মা। তোমার বামের কোটোটা দাও তো...। পালিয়ে বাঁচে মামন।

আমিও না। দিদির পিছনে পা বাড়ায় ভুটো।

জানি, জানি!

কী? কী জানিস? প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ায় ভুটো।

তুইও যাবি না। ফস করে বলে দেয় বুবান। পিঠোপিঠি কিনা বলে কথা।

ছোটকাকা। আমি কিন্তু গুলতি মেরে বুবানের মাথা ফাটিয়ে দেবো। গুলতি ছোঁড়ার মতো দুই হাতের আঙুল টানটান করে ভুটো– কে এমন পিকপিকে সিং! তাকে দেখতে বছর বছর যেতে হবে?

ছোটকাকা কিছু বলার আগেই দৌড় দেয় ভুটো। সোজা দাদুর ঘরের দিকে।

আমিও যাবো না। ছোট্ট ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয় ছোট্টু।

কেন? তুই যাবি না কেন?

যাবো না আমার ইচ্ছে। ব্যাস! বুবানের জবাবে সাফ জানিয়ে দেয় ছোট্টু।

ভূতের ভয়ে! উসকে দেয় তুতাই।

ভূত কি কখনো ভূতকে ভয় পায়? ছোট্টুকে রাগিয়ে দল ভারি করার চেষ্টা করে বুবান।

আহ! না যেতে যায় থাক! চল্ তোদের দেখিয়ে আনি। বুবান আর তুতানের চোখে চোখ রাখে ছোটকাকা।

বেশ চলো। বলেই দু হাতের বুড়ো আঙুল ছোট্টুর চোখের সামনে তুলে ধরে বুবান– ভীতু এ্যাঁ!

সত্যিই। একেবারে পিকপিকে সিং। লিকপিকে শরীরে লিকপিকে হাত। আনন্দে হৈ হৈ করে ওঠে তুতাই।

পিকপিকে! পিকপিকে!

আহ! বড়োদের নাম ধরে ডাকতে নেই। মৃদু ধমক দেয় ছোটকাকা। জিভ কাটে বুবান। কিন্তু অন্ধকারে দেখা যায় না। জিজ্ঞেস করে, পিকপিকে দাদা বলে ডাকবো?

ধুর বোকা। কাকার বন্ধুকে কাকা অথবা কাকু বলে ডাকতে হয়– তাও জানিস নে। আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তারিয়ে তারিয়ে দেখে তুতাই। ছোট্টুটার এলেম আছে। অবিকল না হলেও পিকপিকে সিং-এর ছবিটা খারাপ আঁকেনি।

পিকপিকে কাকুর বাড়ি কোথায়? ছোটকাকার হাত চেপে জানতে চায় বুবান। যা শুনসান অন্ধকার। জোনাকি আর ঝিঁ ঝিঁ-র ডাক। খোলা আকাশের নিচের হালকা শীত শীতে হাওয়া। একটু বুক দুর দুর তো করবেই। দিদিভাই ভুটো ছোট্টু না এসে ঠিকই করেছে। ঘর থাকতে ভয়ের কিল খাওয়ার কোন মানেই হয় না।

ওই যে ওখানে। যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয় ছোটকাকা।

পিকপিকে কাকু কি দাঁড়িয়েই থাকে? সন্দেহ হয় তুতাইয়ের।

হ্যাঁ। পাহারা দেয় কিনা! বসে কিংবা ঘুরে বেড়িয়ে তো আর পাহারা দেওয়া যায় না। মজা করে বলে ছোটকাকা।

এখানে কি কোন কল কারখানা আছে? ঘরবাড়ি স্কুল থানা? ফাঁকা মাঠে কি গাছ পাহারা দেবে? না আকাশ বাতাস? পাহারাদারির যুক্তি বিশ্বাস করতে চায় না তুতাই।

ভূত! ভূ-উ-ত! নিশ্চয়ই ভূত। কেমন দুলছে দেখো। চোখ বন্ধ করে শক্ত হাতে ছোটকাকার হাত চেপে ধরে বুবান। কাঁধের বন্ধুক ঝুলে থাকে হাতের কাছে।

হবে হয়তো। আমি তার কি জানি! আমি জানি ওর নাম পিকপিকে সিং।

পিকপিকে কাকু! ও পিকপিকে কাকু! চিৎকার শুরু করে তুতাই। ফাঁকা মাঠে ওর একটা ডাক দশটা হয়ে ভেসে যায়– পিকপিকে কাকু! ও পিকপিকে কাকু–

আমি বাড়ি যাবো। ভয়ে থরথর করে বুবান।

দাঁড়া আমি দেখে আসি। বলেই দৌড়। জলে ভেজা মাটিতে পা গেঁথে যায় তুতাইয়ের। পুজোয় কেনা নতুন জুতো থপ থপ বসে যায় ঘাস মাটি চিরে।

তুতাই। যাস নে। যাস নে বলছি। ফিরে আয়। পিকপিকে সিং কিন্তু সাংঘাতিক রাগী। তুতাইয়ের দৌড় দেখে ঘাবড়ে যায় ছোটকাকা। নিরস্ত করার চেষ্টা করে। মরিয়া হয়ে। ভাইপো ভাইঝিদের কাছে নিজের জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেলে ওদের সামলানো দায় হবে।

পিকপিকে সিং-এর সামনে এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় তুতাই। মাঠের আলে দাঁড়িয়ে তখনো ডেকে চলেছে ছোটকাকা তুতাই ফিরে আয় বলছি।

আসছি পিকপিকে কাকুকেও সঙ্গে নিয়ে আসছি। একটানে কোলে তুলে নেয় পিকপিকে সিং-কে। কি হাল্কা। কি হাল্কা। শুধু মাথাটা যা একটু ভারি।

খবরদার, তুতাই। ওকে বিরক্ত করিস নে। কামড়ে দেবে। শেষ চেষ্টা করে ছোটকাকা।

আর তুতাই। দৌড়ে এসে পিকপিকে সিং-কে দাঁড় করায় বুবান আর ছোটকাকার সামনে। বুবানের তখনো চোখ বন্ধ।

তুই একটা ডাকাত। বিচ্ছু! তারিফ করে ছোটকাকা।

নামটা তুমি কিন্তু দারুণ রেখেছ ছোটকাকা। দেখ বুবান, দেখ! পিকপিকে কাকুকে একবার দেখ।

না! আমি বাড়ি যাবো। চোখ বন্ধ রেখেই জবাব দেয় বুবান।

চল। তাই চল। পিকপিকে কাকুও আমাদের সঙ্গে যাবে। খেলা করবে আমাদের সঙ্গে।

মিথ্যে মিথ্যে ভয় দেখাবি না ভাই। কাঁদো কাঁদো স্বরে অনুরোধ করে বুবান।

মিথ্যে নয়। একদম সত্যি। চোখ খুলে একবার দেখই না। বুবানকে ঝাঁকিয়ে দেয় ছোটকাকা।

ওমা! এ তো কাকতাড়ুয়া।

কাকতাড়ুয়া হবে কেন? পিকপিকে সিং। পিকপিকে কাকু। বুবানের সব ভয় উড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে তুতাই।

কবিতা ছড়া

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

খুদে ডাকাত

খুদে ঐ ডাকাতটাকে দেখতে শান্ত শিষ্ট
মেরীমাতার কোলে যেমন ছোট্ট যীশুখ্রীষ্ট
আসল কথা নয় তা মোটে
অমন দুষ্টু কমই জোটে
লজেন্‌স দেখলে দিদির ঠোঁটে বলে এট্টু দিস্‌ তো

খুদে ঐ দস্যিটাকে দেখায় যে খুব বাধ্য
কিন্তু যখন কাঁদে, তখন সামলায় কার সাধ্য
ছিঁড়বে পাতা ভূগোল খাতার
শিক বাঁকাবে দিদির ছাতার
সবাই শোনে বাড়ির ভেতর বাজছে রণবাদ্য



হান্‌নান আহসান

মেঘসাগরে যাচ্ছি ঢুকে

ফুটফুটে রোদ-জোছ্‌না মেখে
চাঁদ গিয়েছে ঝরণাতলা
জিরজিরে তার পাথরনুড়ির
আলোর মালায় ডুবছে গলা।

অন্তরালে চুপচাপাটি
শিমুল চাঁপা বকুলপুরী
কীটপতঙ্গ প্রজাপতির
পাখনা ধুয়ে সোনার ঝুরি।

আবীর চাদর সবুজ ঘাসে
কিচিরমিচির পাখপাখালি
জোছ্‌না-চাঁদের হৃদয় জুড়ে
আনন্দিত ফুলের ডালি।

আকাশ এখন নম্র বিনয়
সঙ্গী খুঁজে হচ্ছে সারা
খবর নিয়ে পবন ছোটে
অলক্তিকা সন্ধ্যাতারা।

চাঁদ বলে ভাই রংবাহারি
ঝরণাতলায় অঢেল সুখে
দুধপরীদের মতন আমি
মেঘসাগরে যাচ্ছি ঢুকে।



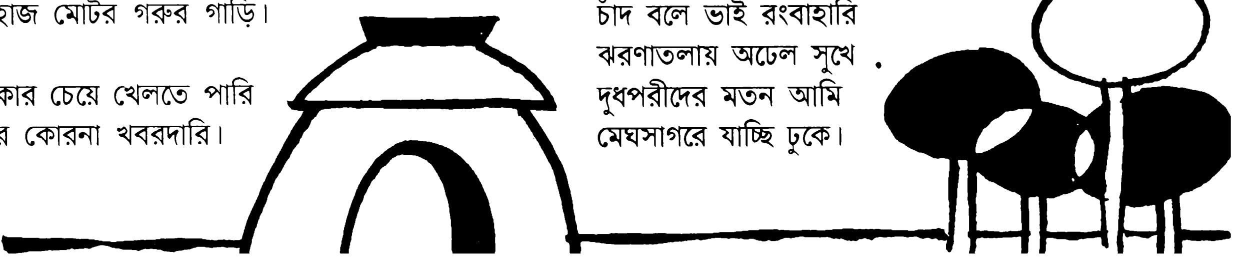
স্বপন বক্‌সী

ভাবছে অয়ন

বিকেল বেলায় পড়তে বসে
ভাবছে অয়ন,
এই সময়ে অঙ্ক কষে
আমার মত কজন?

পড়ার চেয়ে আঁকতে পারি
বন জঙ্গল মাটির বাড়ি—
নদী নালা গাছের সারি
জাহাজ মোটর গরুর গাড়ি।

আঁকার চেয়ে খেলতে পারি
আর কোরনা খবরদারি।



সুরভি ঘটক

সুখের শ্রাবণ দুখের শ্রাবণ

বৃ ষ্ টি উ প ঝ র ণ

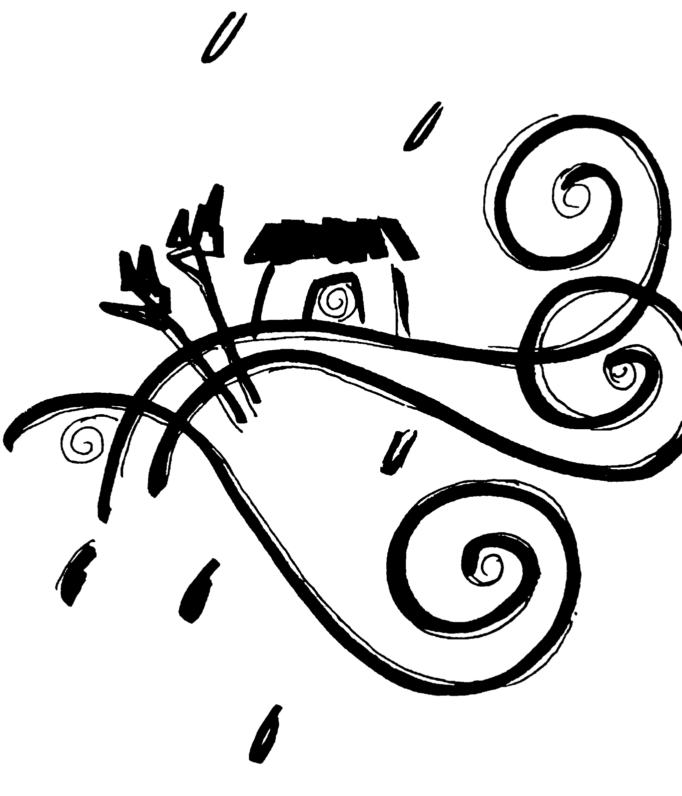
মেঘকন্যা দূরের থেকে, নতুন করে দিল এঁকে
শুকনো গাছের ডালে ডালে সবুজ অলংকরণ।
ঢেউ খেলানো টিনের চালে, বাজছে ঘুমুর তালে তালে
তপ্ত মাটির স্নিগ্ধ বুকে ঘাস ফেললো চরণ॥

বৃ ষ্ টি উ প ঝ র ণ

যেই না বিকেল পাঁচটা বাজে, সবাই জড়ো ঘরের মাঝে
টিভি-র কাচে খোকাবাবু–ফুল পাড়ে রাইচরণ।
বইছে নদী ছলছলিয়ে, বিপদসীমার ওপর দিয়ে
ইলিশ গায়ে ঝিলিক মারে রূপোর আভরণ॥

বৃ ষ্ টি উ প ঝ র ণ

মধ্যরাতে ছপাৎ ছপাৎ, জল ঢুকলো ঘরে হঠাৎ
গ্রামের পরে গ্রাম ভাসালো মেঘের কালো বরণ।
চেনা শহর জলের নিচে, ছুটছে সবাই ডাঙার পিছে
ত্রাণ শিবিরে গৃহ-হারার রাত্রি জাগরণ॥





সৌম্যেন্দু সামন্ত

চোর না ধরার জন্যে

রোজ রোজ চুরি এ-বাড়ি সে-বাড়ি, লেগেছে চুরির ধুম
বিল্টুর পাড়া শান্তিতে নেই, কারও চোখে নেই ঘুম!

বিল্টু পল্টু নিমাই অধীর জোট বেঁধে পাড়া জাগে–
রাত জেগে তারা তবুও চোরকে আনতে পারেনি বাগে।

চুরির মাত্রা বাড়ে...আরও বাড়ে সব্বার হয়রানি...
বিল্টু পল্টু নিমাই অধীর হালেতে পায় না পানি!

নিরুপায় হয়ে ঢেঁড়া পেটে তারা: পারবে যে চোর ধরতে,
হাজার টাকা সে বকশিস পাবে...নয় তা অন্য শর্তে।

এহট ঘোষণাটা পাড়া পাড়া হয়...চোর ধরবার কাজ
শুরু করে দেয় ভিন্ গাঁ-র বিশু, মোস্তাফা, যশরাজ....।

রাতে কৌশলে কত টোপ ফ্যালে এ পাড়ার বাপি, ভোলা–
পুরোপুরি তবু ব্যর্থ সবাই রেখে চোখ-কান খোলা।

মদন দারোগা গোঁফেতে তা দেন, হন না মোটেই হন্যে–
তিনি তো পকেটে ঢোকান দ্বিগুণ... চোর না ধরার জন্যে।

শচীদুলাল চট্টোপাধ্যায়

লেখাপড়া

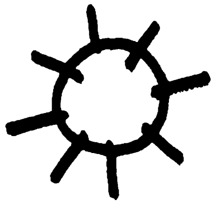
আর কি আমি মুখ্যু থাকি
কতই পড়া পড়ছি দেখ্
এক থেকে এই একশ গুনি
একশ থেকে আবার এক।

ব্যস্ত আমি পড়া লেখায়
আঁকায় জোকায় কুস্তিতে
অনেক বড় হতেই হবে
লেখাই আছে কুষ্ঠিতে!

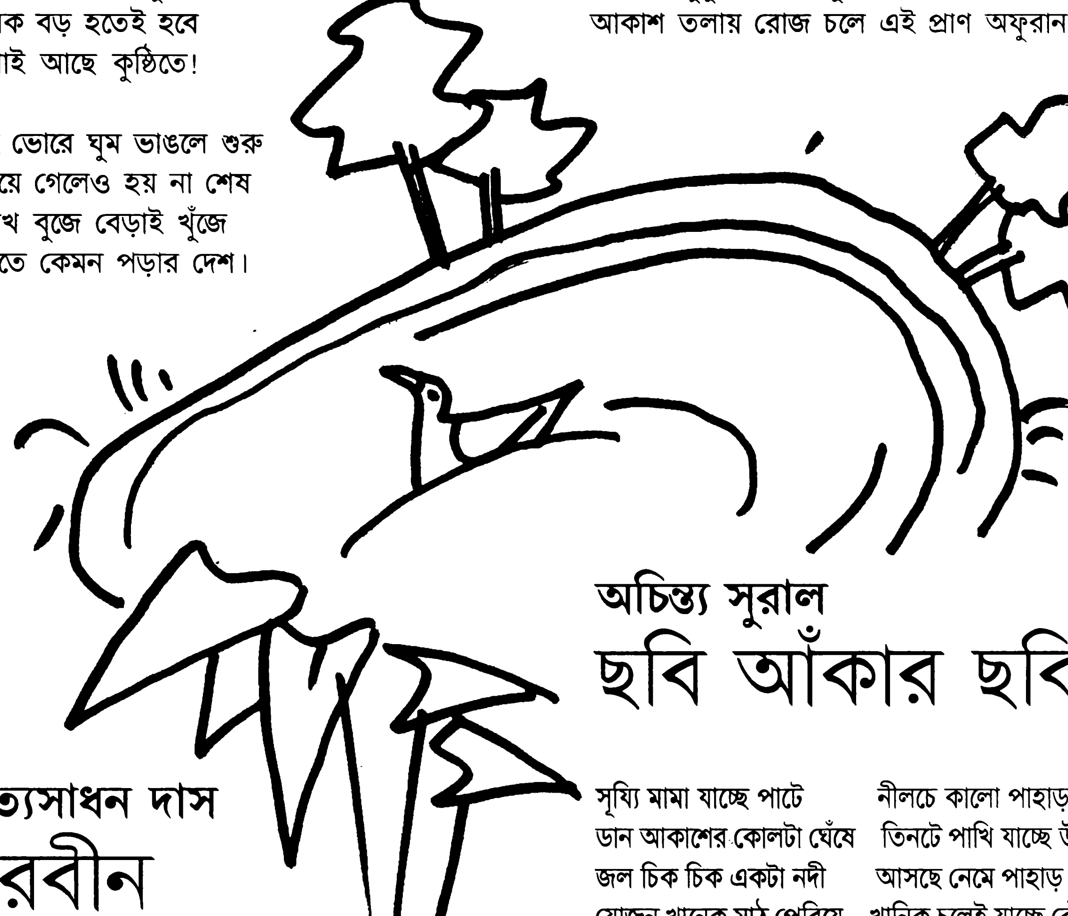
সেই ভোরে ঘুম ভাঙলে শুরু
ঘুমিয়ে গেলেও হয় না শেষ
দুচোখ বুজে বেড়াই খুঁজে
দেখতে কেমন পড়ার দেশ।

হরিশঙ্কর রায়

মাঠের কথা



একখানা মাঠ একটি পুকুর বিকেল বেলা
বলছে ডেকে আয় কাছে আয় করবি খেলা।
আয়না তোরা কচিকাঁচা স্কুলের ছেলে
এখন আবার পড়া কিসের খেলা ফেলে।
আয়রে সবাই মন মেলে দিই সবুজঘাসে
বুক ভরে আজ হাসিখুশির জোয়ার আসে।
মাঠ ও পুকুর কোল জুড়ে তার হইচই গান
আকাশ তলায় রোজ চলে এই প্রাণ অফুরান।



অচিন্ত্য সুরাল

ছবি আঁকার ছবি

সূয্যি মামা যাচ্ছে পাটে
ডান আকাশের কোলটা ঘেঁষে
জল চিক চিক একটা নদী
যোজন খানেক মাঠ পেরিয়ে

নীলচে কালো পাহাড় দূরে
তিনটে পাখি যাচ্ছে উড়ে
আসছে নেমে পাহাড় থেকে
খানিক চলেই যাচ্ছে বেঁকে।

কাশের পরে কাশ ফুটেছে
সবুজ মাঠে চরছে গরু
ছবির নিচে বাঁয়ের দিকে
খানিক তফাৎ পাঁচটা পাথর

হাওয়ায় যেন লাগছে মাতন
মোটেও তাদের নেইকো বাঁধন
সাতটা গাছে জড়াজড়ি
খাচ্ছে যেন গড়াগড়ি।

ডানদিকেতে বট বুড়োটা
তার নিচে এক মাটির বাড়ি
একটা ডিঙি বাঁধা আছে
সব মিলিয়ে একটা ছবি

জটা মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে
দাওয়াটা তার আগ বাড়িয়ে
নদীর ঘাটে খেজুর গাছে
কেউ কোথা নেই ধারে কাছে।

সত্যসাধন দাস

দূরবীন

দেখি দূরবীনে, দূর নিই চিনে
কাছে এসে যায় সুড়সুড়
ছোট পাখিটি গাছে বসে আছে
গান শুনি যেন তুরতুর।

বোশেখ হাওয়ায় দুলছে তখন
প্রকৃতির সব কিছু
দূরবীনে দেখা ছবি এঁকে রাখি
লিখে রাখি তার কিছু।

মুজিবুল হক কবীর

তোমার সাথে যাবো আমি

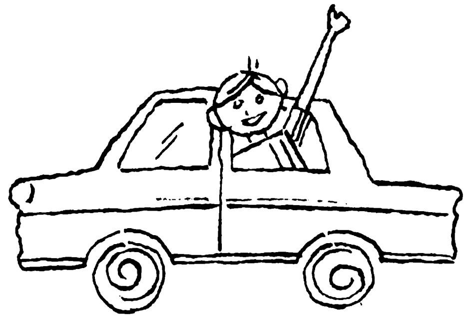
তোমার সাথে যাবো আমি
নেবে আমায়, ভাই?
তোমার কাছে কিবা আছে
চাইবো না তো কিছু
আমি শুধু চাই যে যেতে
তোমার পিছু পিছু।

কোন্ সুদূরে যাবে তুমি?
কোন্ বা দেশে গাঁও?
আছে নাকি গাছের সারি
পুকুর, দিঘি মস্ত বাড়ি
ময়ূরপঙ্খী নাও?

আছে নাকি শান-বাঁধানো
বিরাট পুকুর,
গল্পেসল্পে কাটিয়ে দেয়ার
অলস দুপুর?

বিকেলবেলা চিড়ে মুড়ি
নলেন গুড়ের চা
ধানের গল্প, চাষির কথা
শোলোক-টুলুক ধাঁ ধাঁ।

জানি আমি, সবই জানি
নেই যে তোমার কিছু
আমি শুধু চাই যে যেতে
তোমার পিছু পিছু।



আসলাম সানী

রুম্পা তুমি

রুম্পা তুমি এই শহরে থাকো
লেখো-পড়ো এবং ছবি আঁকো।

জাদুঘরে ঘুরে ঘুরে দেখো
ইতিহাসের অনেক কিছু শেখো।

শিশুপার্কে যখন খুশি ছোটো
গোলকধাঁধাঁর রেলগাড়িতে ওঠো

চিড়িয়াখানা সে-ও তোমার কাছে
বাঘ-ভাল্লুক দেখার সবই আছে।

চকমকে এই কোলকাতাটা পুরো
নিত্য দিনই ট্যাক্সি চড়ে ঘুরো।

রুম্পা তুমি আছো খুবই সুখে
আনন্দও আছে তোমার বুকে।

কিন্তু যারা গাঁয়ে থাকে তারা
এবং যারা ঘুরছে সর্বহারা।

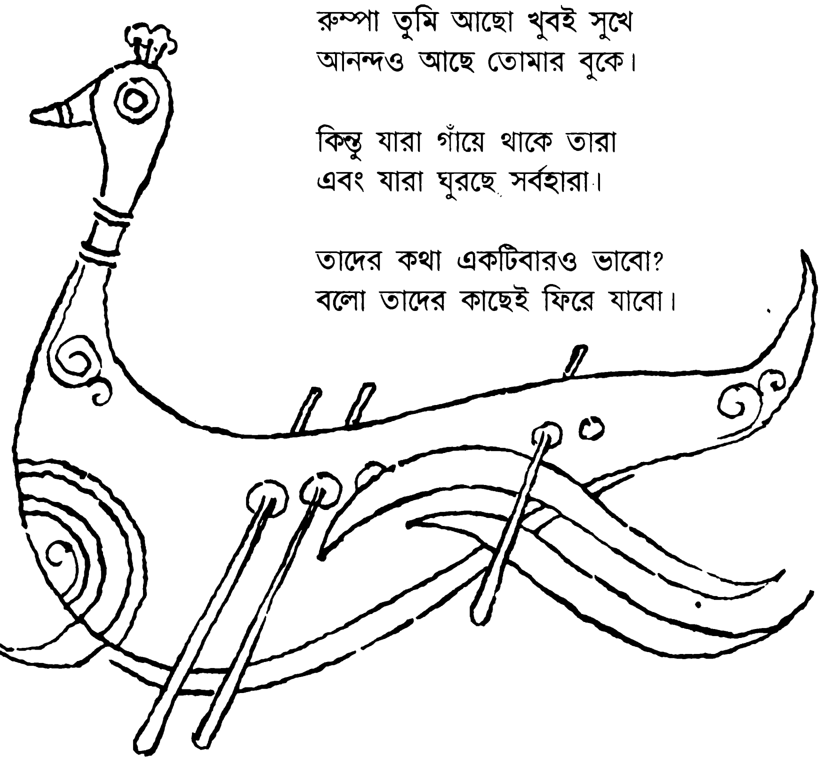
তাদের কথা একটিবারও ভাবো?
বলো তাদের কাছেই ফিরে যাবো।

বাদল ঘোষ

ভুঁড়ি

রাত দুপুরে কড়মড়িয়ে
খায় কেবলই মুড়ি
চলার পথে সবার আগে
যায় ছুটে তার ভুঁড়ি।

ভুঁড়ির আকার পাহাড় সমান
দেখতে ভীষণ খাসা
ভুঁড়ির মাঝে লুকিয়ে আছে
অনেক স্বপ্ন-আশা।



অনির্বাণ ঘোষ

বান্টি ও আকাশ

মিস্টার এবং মিসেস গুপ্তা, বান্টি তাদের পুত্র
সেদিন দুপুরে বইখাতা নিয়ে বীজগণিতের সূত্র
খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ খাতায় কাউকে কিচ্ছু না বলে–
উমলি ঝুমলি ছবি এঁকে খাতা ভরালো আবোল তাবোলে!
আঁকল আকাশ, গাছ, পাখি, ফুল, পাহাড়, নদীর ছবি আর
তার ঠিক নিচে উদ্ধৃতি ছিল চার লাইনের কবিতার।
'বেশ তো হয়েছে কবিতাটা' ভেবে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল
অমনি বান্টি সবকিছু ফেলে বাবাকে দেখাতে ছুটল।

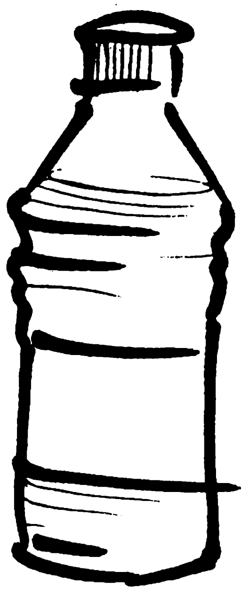
ছুটির দুপুরে খেয়েদেয়ে বাবা নেন খানিকটা গড়িয়ে
ছেলের খাতায় চোখ রাখলেন নিউজ পেপার সরিয়ে।
'বাবা... বাবা... দেখ কবিতা লিখেছি। গাছ, পাখি, ফুল, ধর্ণার
ছবিও এঁকেছি। বড় হয়ে আমি কবি হব, হব পেইন্টার।'
খাতা দেখে বাবা ধমক দিলেন গলা সপ্তমে চড়িয়ে–
হিজিবিজি সব এঁকে আর লিখে খাতাটা দিয়েছ ভরিয়ে?

বান্টি তো প্রায় কেঁদে ফেলে খেয়ে বাবার বেজায় বকুনি
চেঁচামেচি শুনে মিসেস গুপ্তা দৌড়ে এলেন তখুনি,
শেষটা তিনিও সব শুনে রেগে পাকড়ে ছেলের কানটি
বললেন, 'তুমি কী করে এমন অসভ্য হলে বান্টি?
শেষকালে তুমি কবি হতে চাও? হতে চাও ছবি আঁকিয়ে?
ন্যাস্টি চিন্তা মাথায় ঢুকিয়ে কে দিল তোমায় পাকিয়ে?
যাও, গিয়ে বাকি স্টাডি শেষ করো, মিথ্যে কোরো না দেরি
আর
ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবেই তোমায়, সামনে বিরাট কেরিয়ার।
হবে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, যাবে ইংল্যান্ড, ম্যারিকায়...'
চুপচাপ এসে দাঁড়াল বান্টি ফ্ল্যাটের ছোট্ট জানালায়,
দেখতে পেল সে অসীম পাখায় স্বপ্নের রঙ মাখিয়ে
যেন হাতছানি দিচ্ছে আকাশ বান্টির দিকে তাকিয়ে।



নীতীশ চৌধুরী

পরামর্শ



লেখা আছে ট্রেনিং-এর
কোর্সে
হাতে নিয়ে একমুঠো
সর্ষে
বের করো তেল, পিষে
জোরসে,
চান্স পাবে মিলিটারি
ফোর্সে।

যদি কোনো দিন বাই-
চান্স হে
চাকরিটা লাগে খুবই
পানসে
ছেড়ে দিয়ে ওটা এক
চান্সে
তেলকল খুলো গিয়ে
ফ্রান্সে।

বিষ্ণু সামন্ত

গন্তব্য

— কোথায় যাবেন জানেন না তো ?
এমনটা কি ঘটে ?
— জানাই ছিল, একটু আগে
ভুলে গেলাম বটে!
— ভুলে গেলেন ? আচ্ছা ফ্যাসাদ
টিকিট দেব কোথা ?
— সবুর করুন মনে করছি
ওই-যে ওই তো হোথা!
— নামুন, নইলে নামটা বলুন
আচ্ছা, খড়গ্‌পুর ?
— না না, তেমন নয়, তাছাড়া
সে তো অনেক দূর।
— ওহ্ তাহলে যাবেন আপনি
কোথাও কাছাকাছি ?
— মনে পড়েছে মনে পড়েছে
যাব সাঁত্রাগাছি।

স্বপনকুমার রায়
মিথ্যে কোলাহল

তোমার দেশের মাটি যেমন
আমার দেশেও মাটি,
চাঁদ-তারা মেঘ, আকাশ-বাতাস
জোছনা পরিপাটি।

তোমার ডাবের মধ্যে পানি
আমার ডাবে জল,
দুয়েরই স্বাদ একই রকম
মিথ্যে কোলাহল।

আমার দেশের যে গাছটাতে
থোকায় থোকায় আম,
তোমার দেশে কী হয় তাতে
পাঠিয়ে দিও খাম।

তোমার আমার উভয় দেশের
একই ভাষা বাংলা,
তোমার আছে নকশী কাঁথা
আমার বুড়ো আংলা।



সুনন্দা মিত্র
সাদা পাতা

সাদা পাতা, তুমি আমার বন্ধু হবে, ঝগড়ুটে, মারকুটে?
আমায় তুমি সব কথা কি বলিয়ে নেবে, আপত্তি নেই মোটে?
সাদা পাতা, তুমি আমার পুকুর হবে, সাঁতার দেবার জল
ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্টু ছেলে বেড়াক ছলোচ্ছল?
চারপাশে সব পাঁচিল তোলা, সবুজ নেই তো মোটে,
জায়গা তো চাই শ্বাস ফেলবার, কেমন করে জোটে!
তুমি আমার সবুজ হবে, বিশাল খোলা মাঠ?
তোমার কাছে আসবো যাবো পেরিয়ে চৌকাঠ!
সাদা পাতা, তুমি আমার স্বপ্ন হবে, অসম্ভবের খেলা?
তোমার সাথে মনে মনে কথা বলে কাটবে সারা বেলা!
তোমায় চিনি প্রথম থেকেই, যদিও তুমি চুপটি করে থাকো;
এবার আমি ফিরে যাবো তোমার কাছেই তৈরী করে সাঁকো।
আসবে আরো দুষ্টু যত-ভালোর সাথে আড়ি
মাটির উপর বানিয়ে নিতে মেঘের বসতবাড়ি।

চিন্ময় দাশ
ছড়ায় ছড়ায় খেলা

আকাশে যখন মেঘেদের আনাগোনা
কে ছড়াল আজ ফুলঝুরি-রোশনাই!
নেমেছেন তিনি ক্রিকেটের আলাদিন
শচীন রমেশ– রান চাই, আরও চাই।

সবুজ মাঠের চারদিক ঝলমলে,
তবুও ওদের নেই অবসর, ছুটি।
টেনিস র‍্যাকেটে ঝড় ওঠে দিনরাত,
ভিতরে খেলছে ভূপতি-লিয়েন জুটি!

সোনালি গোলক বারবার ছুঁয়ে যায়–
বুলেটে বুলেটে বারুদের ধোঁয়াজাল,
ভারতবর্ষ সোনার তবকে মুড়ে
তিনি অবিচল, যশপাল যশপাল!

জলের গভীরে ছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
শরীর তখন বাতাসে শিমুল তুলা–
ডোভার চ্যানেল অনেক পিছনে রেখে
এগিয়ে চলেছে আমাদের বোন বুলা!

তাপসকুমার রায়
কমিকস্ রাজ্যে

সুপারম্যান ও টারজানে
লাগলো লড়াই না থামে

অরণ্যদেব এসব দেখে
বলে জাদুকর ম্যানড্রেকে

শুনেছেন কী শোরগোল
কমিকস্ রাজ্যে গন্ডগোল?

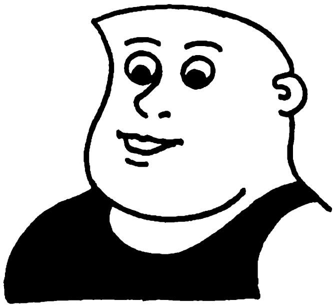
আপনি বরং খবর দিন
ছোট্ট হিরো সে টিনটিন

বাংলার ঐ পালের গোদা
সফল জুটি হাঁদা-ভোঁদা

এবং দি গ্রেট বাঁটুলকেও
বুদ্ধি দেবে বলছি সেও

সবাই মিলে হয়ে জড়ো
বলবো একটা বিহিত করো

না হলে তো মাথায় বাজ
ফস্কে যাবে পাঠক-সমাজ।



কালিদাস ভদ্র
পুতুল পুতুল

তুল তুল তুল খুকুর পুতুল
ঠোঁটটা লালে লাল,
কল কল কল খিল খিল খিল
হাসলে ফোলে গাল।
পুতুল পুতুল খুকুর পুতুল
দম দিলে যায় চেনা,
জাপান থেকে অনেক দামে
তাইতো বুঝি কেনা!

শফিক ইমতিয়াজ
হাতে যদি টাকা হয়

হাতে যদি টাকা হয়
বাড়ীঘর পাকা হয়
বড় বড় ভোজসভা
ফাংশানে ডাকা হয়।

হাতে যদি টাকা হয়
গুলশানে থাকা হয়
ব্যাংকের হিসাবেতে
মোটা টাকা রাখা হয়।

হাতে যদি টাকা হয়
উড়বার পাখা হয়
অনেকেই কাছে এসে
ফুপা খালু কাকা হয়।

হাতে যদি টাকা হয়
বুদ্ধিতে পাকা হয়
কুকাজের ইতিহাস
টাকা দিয়ে ঢাকা হয়।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য
কর্মচারী চাই

করছি দাদা কষ্ট অনেক খাটনি আছে প্রচুর
ভূত ধরা এ ব্যবসাখানা নয়ত ভাজা কচুর।

তাল ঠ্যাংরা ভূত ধরেছি দিয়ে তালের বড়া
রাক্ষুসে ভূত জব্দ খেয়ে একশো মশা মড়া।

বেম্মোদত্যি শিশির মধ্যে পৈতে পরে গলায়
খ্যাংড়া কাঠি ভূত পেত্নি ঐ ঝুড়িটার তলায়।

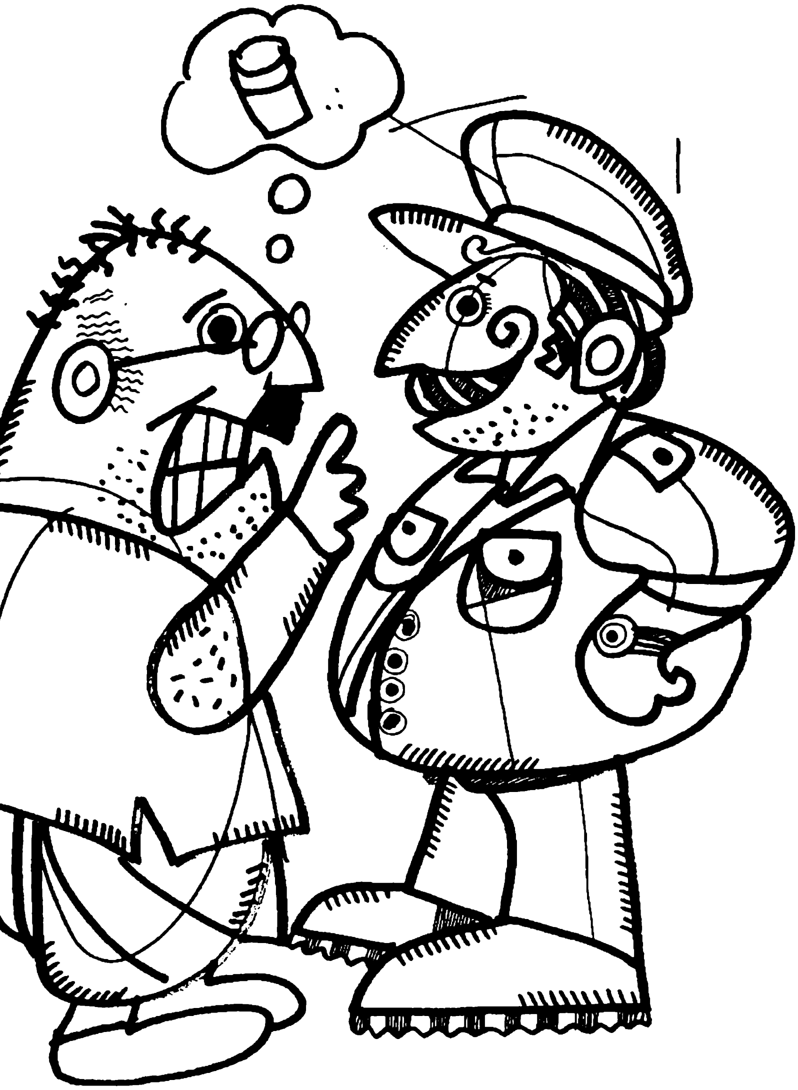
বছর খানেক বেচছি আমি বহু খদ্দের আছে
ঝি-এর জন্য অর্ডার দিতে আসেও আমার কাছে।

লাভের ব্যবসা জবর আছি কর্মচারী চাই
আপনি দাদা সেই জন্য এলেন বুঝি

গল্প

কল্পনা ভট্টাচার্য

চুরি রহস্য



হরিরামবাবুর বাড়িতে ইদানিং প্রায়ই চুরি হচ্ছে, তবে চুরিটা একটা অন্যধরনের, টাকাপয়সার ওপর চোরের তেমন লোভ নেই, নজরটা ছোটখাটো জিনিসের দিকেই।

এই তো সেদিন– বিনু সবে ইস্কুল থেকে ফিরে গলার টাইটা খুলে টেবিলে রেখে একটু উঁকি দিয়ে দেখতে গেছে বিকালের টিফিনের মেনুটা, অমনি ফিরে এসে হুলুস্থুল কান্ড! অমন লাল টুকটুকে টাইটা কী না উধাও! ঘরের দরজাও তো বন্ধ ছিল, তবে ঘরের থেকে কী ভাবে উড়ে গেল অমন লম্বা লেজওলা টাইটা! তবে কী চোর আগেভাগেই ঘরের ভেতর... না- ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারেনি বিনু।

বিনুর দাদা রনি। ক্লাস সেভেন-এ পড়ে। সখ একটাই, ফাঁক ফোঁকরে গোয়েন্দা গল্প পড়া। চালচলনে সর্বদা গোয়েন্দা গোয়েন্দা ভাব। বিশ্বের সব কিছুকেই সন্দেহের চোখে দেখে। বিনুর মুখে সব শুনে রনি ভ্রূদুটো কপালের ওপর ইঞ্চি তিনেক তুলে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে বলেছিল, ‘দেখতে হবে প্রথমে চোরের মোটিভটা কি? এ ব্যাপারে বাড়ির সব্বাইকে জেরা করতে হবে।’

ঠাকুমার পায়েসভাগের মতো ছোট থেকে বড়– এই নিয়মে প্রথমেই বিনুর পালা। রনি চশমাটা নাকের ডগায় ঠিক মতো বসিয়ে ঝানু গোয়েন্দার ঢঙে বিনুকে প্রশ্নটা করল, ‘ঠিক মতো ভেবে বল, ইস্কুল থেকে ফিরে টাইটা ঠিক কোথায় রেখেছিলি?’

বিনু গালে হাত দিয়ে ভেবে নিয়ে বলল, ‘ও-ই তো টেবিলের ওপরে।’

‘এ ব্যাপারে তোর কি কাউকে সন্দেহ হয়?’

দাদার প্রশ্নের উত্তরে বিনু ধীরে ধীরে বার দুয়েক ঘাড় নেড়ে জানাল, ‘না–’

ম্যাঁও– ম্যাঁ-ক্যাঁচ-ফোঁ-ফোঁস–

‘আঃ, বড্ড জ্বালাচ্ছে ওরা’। – রনি বিরক্ত মুখে ওদের তাড়াতে গেল। কাজের সময় এমন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ মোটেও ভালো লাগে না রনির।

বিনুও ছুটে গেল জানলার কাছে। পাঁচিলের ওপরে হুলো আর পুতিটা ঝগড়া করছে। একটু পরেই ঝুটোপুটি করবে। বেশ মজা লাগে বিনুর ওদের দেখতে। বিনু রোজ ওদের বিস্কুট দেয়। সেদিনের মতো ওরাই রনির গোয়েন্দাগিরি বন্ধ করে দিয়েছিল।

আবার এক চুরি! গতকালই এক জবরদস্ত চুরি হয়েছে হরিরামবাবুর বাড়িতে। হরিরামবাবুর বৃদ্ধা মা চোরের চুরির বহর দেখে মূর্চ্ছা যান আর কি! এবারের চুরি প্লাসটিকের পুরোনো এক পাটি দাঁত।

রাতে শোবার আগে প্রতিদিনের মতো হরিরামবাবুর মা এক বাটি জলে দাঁতের পাটি জোড়া ভিজিয়ে রেখেছিলেন। সকালে উঠে তার এক পাটি দেখতে না পেয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! বাটিতে দাঁত নেই। বেমালুম হাওয়া।

‘ও-মা গেল– কী সব্বোনেশে কান্ড গো–’

সক্কালবেলা ঠাকুমার কান্না শুনে রনি, বিনু আর ওদের মা ছুটে এসে দেখেন ঠাকুমা কপাল চাপড়ে চাপড়ে কাঁদছেন। ঠাকুমা কাঁদছেন আর বলছেন, দাঁত চুরি। ছি-ছি-ছি– ও-মা-গো– কোথায় যাব গো– বিছানায় শুয়ে হরিরামবাবুও শুনছেন। এসব নাকী এ বাড়ির নিত্য দিনের ঘটনা। তাঁর রাগের ভয়ে

এ কথাটা এতদিন কেউই তাকে বলতে সাহস করেনি। এবার তিনি নিজের কানেই মার পরিত্রাহি কান্না শুনলেন। তারপর মুগুর ভাঁজা হাত বার কয়েক শূন্যে ঘুরিয়ে তিনিও সমান হুংকার দিলেন, 'ধরলে ছাড়ব না– চুরি ইজ্ চুরি- এবং সেটা আমার বাড়িতে। বিহিত করবই। থানায় যাব–।'

মুহূর্তে সেদিন বাড়ির চেহারাটাই পাল্টে গেল। বিনুর মা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে হরিরামবাবুকে ঠান্ডা করলেন। সেদিন অফিস থেকে ফেরার সময় হরিরামবাবু মাকে এনে দিয়েছিলেন নতুন এক পাটি প্লাসটিকের দাঁত।

পরের দিন রবিবার, এদিন হরিরামবাবু বেশ জাঁকিয়ে বাজার করেন। ভোজনরসিক বলে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়মহলে দীর্ঘ বৎসর যাবৎ ফার্স্ট হয়েই আছেন, হাতে চার পাঁচটা থলে, বেরুতে যাবেন, হরিরামবাবুর মা – রনিবিনুর ঠাকুমা সামনে এসে একগাল হেসে ছেলেকে বললেন, 'বাবা হরে', বাজার থেকে আজ একটা নাদুস নুদুস মুড়ো আনিস তো বাপ– তোকে মুড়োঘন্ট করে দেব–। সে কথা শেষ হয়না ফস্ করে ঠাকুমার নতুন প্লাসটিকের দাঁত মাটিতে খসে পড়ে। খসে পড়া দাঁত হাতে নিয়ে ঠাকুমা আবার কেঁদে ফেললেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হরে রে, ও-ই দাঁতগুলোর জন্য বড্ড মন খারাপ রে– এ গুলো ঠিক সেট হচ্ছে না– তুই বাপ ও গুলোর একটা বিহিত কর বাবা–'

হরিরামবাবু গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে বাজার চলে গেলেন। ফের চুরি। মালুম পাওয়া গেল হরিরামবাবু বাজার থেকে ফেরার মিনিট দশেক পরে। মুড়োঘন্টর সব জোগাড় করে মুড়োটা খুঁজতেই সব তোলপাড়। মুড়ো নেই! ব্যাগ শুদ্ধু লোপাট।

বাজার থেকে ফিরে নস্যিটা নাকে বেশ কড়া করে নিয়ে খবরের কাগজটা মন দিয়ে পড়ছিলেন হরিরামবাবু। হঠাৎ রান্নাঘরের হুলুস্থুলু কান্ড গরম বাষ্প হয়ে এসে তার কানেও ঢুকলো। উনি শুনলেন, ব্যাগ সমেত কাৎলার মুড়ো হাওয়া। হরিরামবাবু কাগজ ফেলে ছুটে এলেন রান্নাঘরে। সত্যিই তো। মাছের ব্যাগ নেই। রাগে-দুঃখে ওনার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল। ব্যাপার দেখে বিনুর মুখে টুঁ শব্দ নেই। রহস্য উদ্ঘাটনের কৌশল খুঁজতে রনিও অস্থির পায়ে নিজের ঘরে পায়চারি করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে গোয়েন্দা গল্পের বই খুলে চোরের মোটিভ খুঁজতে লাগল।

রাগে গনগনে আগুনের গোলা হয়ে রান্নাঘর থেকে বেরুলেন হরিরামবাবু। আজ এই মুহূর্তে তিনি এর বিহিত করতে চান। এক্ষুনি থানায় যাওয়াও দরকার– দরকার নস্যি নেওয়ারও, মাথাটা ঝিমঝিম করছে যে তাঁর।

'আরে– আরে– আরে আমার নস্যির ডিবেটা কোথায় গেল?' হরিরামবাবুর চিলচিৎকারে বাড়ির সব্বাই একসঙ্গে তাঁর ঘরে দৌড়ে এল।

এ্যাঁ! তাজ্জব ব্যাপার! এখানেও চুরি। স্বয়ং হরিরামবাবুর নিজ ঘর হইতে নস্যির ডিবে। ভাবতেও পারে না কেউ। অথচ হয়েছে প্রায়ই হচ্ছে এ ধরনের চুরি। কথাটা নিজের মনেই আওড়াতে লাগল গোয়েন্দা রনি।

হরিরামবাবুকে আর থামিয়ে রাখা গেল না, উনি ছুটলেন থানার দিকে। থানার বড়বাবু সুবলধারী গঙ্গো ওনাকে বেশ মান্যি করেন। সব শুনে দারোগা সুবলধারী গঙ্গো খ্যাঁক খ্যাঁকে গলায় বলে উঠলেন, 'না না, এ ভাবে চুরি বরদাস্ত করা যায় না। তবে– চোরটা বেশ ঝানু, হিসেব কষেই চুরি করছে। একদিন করছে- একদিন করছে না – একদিন ... ঠিক আছে আমি দেখছি। আজই এলাকার সব ক'টাকে তুলে আনছি।'

দারোগার আশ্বাস পেয়ে হরিরামবাবু ফিরে এলেন বাড়িতে। এ বারে চোর বাবাজি টেরটি পাবে, কার বাড়িতে ঢুকেছে। মনে মনে কথাটা বিড় বিড় করে বলতে থাকেন হরিরামবাবু।

গভীর রাত। বাড়ি শুদ্ধু সবাই ঘুমে অচেতন। ঘুম নেই খালি রনির, ওর মাথায় তখন চোরের কথাই ঘুরছিল। পাশের খাটে বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন হরিরামবাবু। নিঃস্তব্ধ বাড়িতে নাক ডাকার শব্দ কামানের গোলার মতো সারা বাড়িতে গম গম করে বাজছে।

হঠাৎ, একটা খুট করে শব্দ! কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে পা টিপে টিপে ওপর দিকে উঠে গেল। রনি কান খাড়া করল। অস্পষ্ট ক্ষীণ এক শব্দ! রহস্য ভেদে রনি তৈরি হল। টর্চ জ্বেলে খুব সাবধানে সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘরের ডিম লাইটটা জ্বালল, পা টিপে টিপে চার পাশ দেখে নিল। ফ্যাঁচ– ফ্যাঁচ– ফ্যাংচ কয়েকটা চাপা হাঁচির শব্দ। শব্দটা ওপর দিক থেকেই আসছে। রনির ধারণা ওপরে যে গেছে সে-ই হাঁচছে। তবে প্রাণপন চেষ্টা করছে হাঁচি চাপতে– কিন্তু বোধ হয় পারছে না।

এবারের শব্দটা আরো জোরে হল। এবং পর পর কয়েকটা। ফ্যাঁ–ফ্যাঁ ঘরে আলো। হরিরামবাবু চোখ খুললেন, দেখলেন রনি টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ্যাই কে? কে-– রে–? চোর? পুলিশ– ধরু...।'

'চুপ বাবা চুপ। অত চেঁচালে চোর যে পালাবে। আস্তে আস্তে উঠে এস। কায়দা করে চোরকে ধরতে হবে– ওর বোধহয় সর্দি হয়েছে।'

মাঝরাতে হরিরামবাবুর চোর– চোর শব্দে বাড়ির অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। সব ঘরের আলো জ্বলে উঠল ফট্-ফট্-ফট্। ঠাকুমা, রনি বিনুর মা সব্বাই হরিরামবাবু আর রনির পেছন পেছন লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। ঠিক সিঁড়ির মুখেই। চোর পালাতে গেলেই একেবারে ক্যাচ-কট-কট।

প্রথমে টর্চ হাতে রনি ওপরে ওঠতে লাগল। পেছনে তেল মাখানো লাঠি হাতে হরিরামবাবু– আর তারপর?

তারপরেই ঘটল সে-ই ঘর কাঁপানো বিস্ফোরন। ওদের পায়ের শব্দে সিঁড়ির চিলছাদে প্রকান্ড এক হুড়ুম দুড়ুম শব্দ। ভয়ানক শব্দ করে ভারি কিছু একটা আছড়ে পড়ল যেন মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে সারাবাড়িও লোডশেডিং। চারপাশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। রনি বলল, 'বাবা– ক্যুইক চোর টের পেয়েছে। ধরতে হবে...।'

হরিরামবাবু আর রনি দ্রুত গতিতে ওপরে এসে যা দেখল তাতে তো তাদের চক্ষু তালবড়া। সিঁড়ির ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হরিরামবাবুদের সাবেকি পরিত্যক্ত ক্যারামখানা, আর তার একটু দূরে খেলা করছে সাদা ধবধবে তিনটে বেড়ালছানা। একটা জড়িয়ে ধরে আছে বিনুর সেই লম্বা লেজওলা লালটুকটুকে টাইটা। আর একটা মনের সুখে ঠাকুমার হারানো দাঁত নিয়ে কামড়াচ্ছে। আশে পাশে ছড়ানো মাছের কাটার ওপর শুয়ে ঘুমাচ্ছে আর একটা। আর একটু দূরে পুরোনো কাগজের স্তূপের ওপর বসে পুষিটা হরিরামবাবুর নস্যির আধ চিবানো ডিবেটা পায়ে চেপে তখনও হেঁচেই চলেছে ফ্যাঁচ–ফ্যাঁচ– ফুঁচ– অনবরত হাঁচির চোটে ওর যে তখন কোনদিকেই তাকাবার হুঁশ নেই।

গৈরিক গাঙ্গুলী

সবুজ দ্বীপ

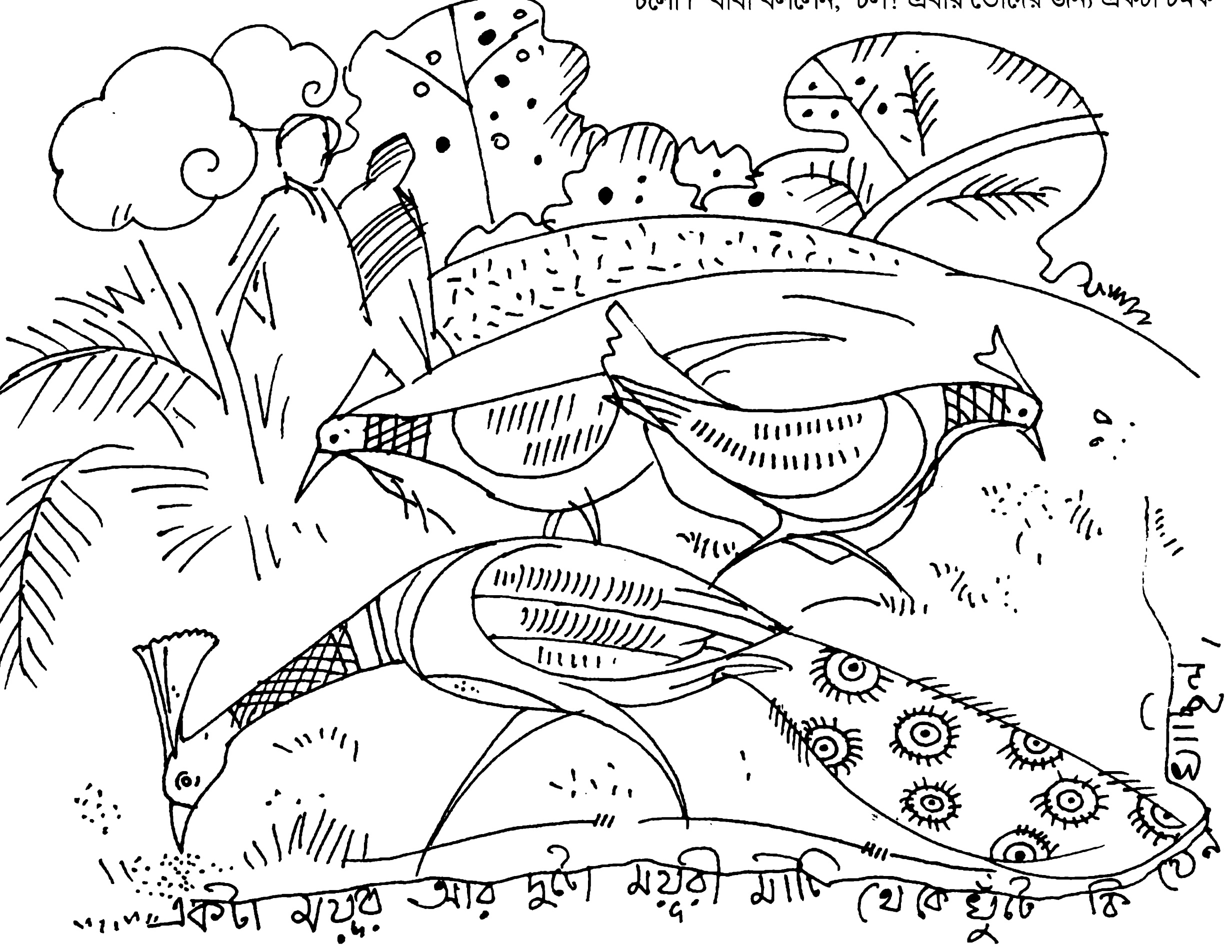
বলরামপুর শহরের শেষ প্রান্ত বেড়মায় আদিগন্ত টাঁড়টা দক্ষিণদিকে ঢালু হতে হতে নেমে গেছে বহুদূর পর্যন্ত। তারপর উঠেছে গিয়ে সেই দলমা পাহাড়ের পায়ের কাছে। ঐ মাঠটা যেখান থেকে ঢালু হতে শুরু করেছে সেইখানে একটা উঁচু জায়গা আছে ঢিবি মতো। আমরা নাম দিয়েছিলাম 'গাঙ্গুলী'জ মাউন্ড' বা গাঙ্গুলীদের ঢিবি। সেটার উপর দাঁড়িয়ে আমরা দূরের দলমা পাহাড়ে সূর্যাস্ত দেখতাম।

আমাদের বাড়ি থেকে বেড়মা যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা বলরামপুর বাজার হয়ে টাটা রোড দিয়ে অনেক ঘুরে। আর অন্যটা বরাভূম স্টেশানের প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে রেলের মালগোদাম পার করে পাথুরে কাটিংটা টপকে ক্ষেতের আল ধরে ধরে পৌঁছে যাওয়া। সেই রাস্তায় ডানদিকে ক্ষেতগুলো রাখলে ঠিক বাঁহাতে ছোট একটা পুকুরের (বাঁধের) এক পাড়ে কাছাকাছি চারটে শাল গাছ আছে। আর তার একদম উল্টোদিকে পুকুরের অন্য পাড়ে আছে একটা মাত্র শাল গাছ। সে যেন বড্ড একা। দেখে মনে হতো রাত বাড়লে দু'পাড়ের শালগাছেরা নিশ্চই এক জায়গায় এসে গুঁটিসুটি মেরে রাত কাটায়।

যাইহোক, আগেরটা অনেক ঘুরপথ বলে আমরা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে শর্টকাট রাস্তায় যেতাম। দেশের বাড়িতে থাকলে প্রায় রোজই শেষ বিকেলে আমরা বেড়মা যেতাম ঐ পথে ধরে– সূর্যাস্ত দেখতে।

কোনো কোনো দিন বাড়ি থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেলে বাবা আর আমরা দুভাই দৌড়োতাম প্ল্যাটফর্ম ধরে মালগোদাম পেরিয়ে কাটিংটার উপর দিয়ে। সেখান থেকে বাঁয়ে নেমে যখন আলপথ ধরতাম, তখন হয়তো পশ্চিমে সূর্যিমামা ডুবুডুবু। যেদিকে যতদূর চোখ যায় নানান শেডে শুধু লাল আর লাল। আকাশের লাল এসে মিশেছে রুক্ষু লাল মাটিতে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম আমরা তিন বন্ধু (বাবা আর আমরা দু'ভাই)। সময় যেন থমকে দাঁড়াতো কিছুক্ষণের জন্য। কিযে ভালো লাগতো কি বলবো। ঈশ্বর বোধহয় এইসব মুহূর্তে তাঁর শ্বেতপাথরের বেদির উপর থেকে নেমে এসে ছোটদের হৃদয় স্পর্শ করেন।

সারা বছর শহরে থাকা। পুজোর ছুটিতে, শীতের ছুটিতে, কখনও বা গরমের ছুটিতে বলরামপুর, পুরুলিয়া যাওয়া। সেবার গেছি শীতের ছুটিতে। দিন দুই হবে বলরামপুর পৌঁছেছি। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর বাবা বললেন 'কিরে! বেড়ামা যাবি তো?' আমরা একপায়ে খাড়া, বললাম, 'আজই চলো।' বাবা বললেন, 'চল! এবার তোদের জন্য একটা চমক



আছে।'

যেই বলা সেই কাজ। রওনা হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। সবে প্ল্যাটফর্ম, মালগোদাম ছাড়িয়ে পাথুরে কাটিংটার মাথায় পৌঁছেছি, বাবা বললেন, 'এবার দাঁড়া। সোজা তাকিয়ে দেখতো কিছু দেখতে পাচ্ছিস?' বলে আঙুল তুললেন দূর দক্ষিণের দিকে। সেই আঙুল বরাবর তাকিয়ে দেখি বালি-পাথরের সেই দিগন্ত বিস্তৃত 'প্রায়-মরুভূমি' টাঁড়ের একপ্রান্তে যেন আলাদিনের প্রদীপের ছোঁয়ায় তৈরি হয়েছে একটা গাঢ় সবুজ দ্বীপ।

আবাক হয়ে বলি 'ওটা কি বাবা?' বাবা বললেন, 'ওটা সুখেনের বাগান। চল, আজ ওখানেই যাবো।'

যেতে যেতে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকি আমরা। 'বাবা, যার বাগান বললে তিনি কে?'

বাবা বলেন, 'আমার ছোটবেলায় বলরামপুর ক্রিশ্চান মিশনের এক দিদিমণি মিস বিশ্বাস আমাকে বাড়িতে এসে ইংরাজি পড়াতেন। আমি বলতাম 'বিশ্বাস মাসিমা'। সুখেন তাঁরই ভাইপো। ছেলেবেলা থেকে ওনার কাছেই মানুষ।'

ভাই জিজ্ঞেস করে, 'উনি কি করেন বাবা?'

'উনি সারাদিন বাগান করেন, তুলোর চাষ করেন, বই পড়েন, আর সময় পেলেই পাহাড়ি রাস্তায়, জঙ্গলের পথে দৌড়ে বেড়ান। সুখেন খুব ভাল অ্যাথলেট। ব্যাস, আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। বাগানে কি কি গাছ আছে, গাছ ছাড়া আরো কিছু আছে কিনা এসব প্রশ্ন একদম করবে না। আমি উত্তরও দেবো না। নিজেরাই গিয়ে দেখে নিও।' এই বলে আমাদের কৌতূহল আরো উস্কে দিয়ে বাবা চুপ করে যান। আমরা জোরে জোরে পা চালাই।

দূর থেকেই দেখা যায় বাগানের চারিদিক ঘিরে অমরিখাড়ার বেড়া। এই গাছের ডালপালা, পাতা, কল্কের মতো দেখতে সুন্দর বেগুনী ফুল– সব বিষাক্ত। আর সেই কারণেই গরু, ছাগল, ভেড়া সবাই এই গাছকে এড়িয়ে চলে। বাগানে ঢোকার মুখে কাঠ আর বাঁশের তৈরি কাজ চালাবার মতো একটা গেট রয়েছে। ভিতরে সবুজের হাট। পেঁপে, কলা এবং আম গাছই বেশি, তাছাড়া অন্য অনেক গাছও আছে। তবে কোন গাছই খুব লম্বা নয়। এমনকি লাফিয়ে আম গাছগুলোর মাথা ছোঁয়া যাচ্ছে দেখে আমাদের তো বেশ আনন্দই হচ্ছিল।

দেখে বাবা বললেন, 'মোটে এক বছর বয়স তো বাগানটার তাই গাছগুলো এখনও ছোট ছোট।'

কয়েক একর জায়গা জুড়ে বাগান। বোঝা গেলো না কত বড়– তাই তো? তবে শোন, সাতশো চল্লিশ বর্গ ফুটে এক কাঠা, কুড়ি কাঠায় এক বিঘা আর তিন বিঘায় হয় এক একর। এরকম কয়েক একর জায়গা নিয়ে তৈরি এ বাগান। তারই মধ্যে পুকুর, সেখানে রাজহাঁস ঘুরছে। সাঁতার কাটছে দলবেঁধে। রয়েছে বিরাট একটা পাড় বাঁধানো ইঁদারা। দুটো বাড়ি-মাটরি, মাথায় খাপরা দেওয়া। চওড়া চওড়া মোরামের রাস্তাগুলো চলে গেছে বাগানের এপ্রান্ত থেক ওপ্রান্তে। মোরামের রাস্তাগুলো দিয়ে সবুজ বাগানের উপর যেন লাল মার্জিন টানা হয়েছে। ছোট বাড়িটার দাওয়ায় একটা ময়ূর আর দুটো ময়ূরী মাটি থেকে খুঁটে কি যেন খাচ্ছিল। কেবল বাগান দেখতে এসে এত কিছু দেখে আমরা দু'ভাই আনন্দে দিশাহারা! পাশে দাঁড়িয়ে বাবা চেঁচিয়ে ডাকছিলেন 'সুখেন, ও সুখেন। দেখো কাদের নিয়ে এসেছি।'

বাবার ডাক শুনে মাটির সেই দোতলা ঘর থেকে নীলরঙের ট্র্যাকস্যুট গায়ে লম্বা ছিপছিপে চেহারার যে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, গায়ের রঙ তাঁর বেশ কালো কিন্তু চোখ দুটো দারুণ চকচকে।

'আরে! দাদা আপনি!' বলেই বাবাকে প্রণাম করলেন ঢিপ করে। আমাদের দু'ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললেন 'আলো বুবুকেও নিয়ে এসছেন? চলো তোমাদের বাগান ঘুরে দেখাই।' এই বলে আমাদের হাত ধরে নিজে ঘুরে ঘুরে বাগান দেখাতে থাকলেন। আর বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন এরপর কোথায় কি করবেন তাই নিয়ে। বাগানের মধ্যে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা-কালো, খয়েরি-সাদা আর ছাই রঙের দিশি খরগোশেরা। রাজহাঁসেরাও কখনও কখনও জল ছেড়ে সেই দলে। বাগানের মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে ধারে ছোট ছোট লিলিপুল– তাতে ফুটে রয়েছে নীল, লাল, হলুদ শালুক। রয়েছে আমজন সোর্ডপ্লান্ট। বাগানের একদিকে একটা ছোট ঘেরা লনে বেশ কয়েকটা চিতল হরিণের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে প্রাণীটা, সেটা একটা নীলগাই। বাবা চিনিয়ে দিলেন। সুখেনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একে কোথা থেকে জোটালে?' সুখেনদা বললেন, 'শিকার পরব' ফেরৎ একদল দিয়ে গেছে। তখন একেবারে ছোট ছিল। ঐ লনেরই লাগোয়া হরিণদের থাকার খড়ের একচালা।

এরপর সুখেনদা আমাদের নিয়ে গেলেন তিনি যেখানে থাকেন সেই বড় দোচালা বাড়িটায়। সেই বাড়িতে ঢোকার যে দরজা তার পাশেই দেয়াল জুড়ে রয়েছে একট লতানে গোলাপ গাছ-– 'মার্শাল নীল'। আর তার বড় বড় গোলাপি ফুলে ভরে আছে দেয়ালটা। সুন্দর করে গোছানো ঘরের ভিতরে অনেকগুলো লণ্ঠন এদিক ওদিকে। খাবার টেবিলের উপর ঝকঝকে রূপোর মোমদানিতে দুটো খুব লম্বা সাদা মোমবাতি জ্বলছে। দেয়ালে যিশুর 'লাস্ট সাপার'-এর ছবি।

আমাদের টেবিলে বসিয়ে সুখেনদা দুটো ইয়াব্বড় সাদা বলের মতো জিনিস আমাদের দু'ভাইয়ের হাতে দিয়ে বললেন, 'বল তো এটা কি?' বাবা দেখলাম তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। সুখেনদাই বলে দিলেন 'এগুলো রাজহাঁসের ডিম। কি খাবে নাকি ডবল ডিমের ওমলেট।'

এরপর নীল শাড়ির উপর কালো কার্ডিগনে গায়ে সাদা শনের নুড়ি চুলের এক বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে এসে আমাদের গাজরের হালুয়া দিলেন প্লেটে সাজিয়ে। বাবা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, 'কেমন আছো, অমল?' 'ভালো!' আপনি কেমন আছেন মাসিমা? 'ঐ আছি একরকম।' আমরা বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে প্রণাম করি বাবার বিশ্বাস মাসিমা মানে আমাদের সেই দিদাকে। আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন বুড়ি 'গড ব্লেস ইউ মান সন্।'

ফেরার পথে বাগানের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যান সুখেনদা। সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে দলমা গিরিমালার পিছনে। দিগন্ত লালে লাল। চারিদিকে অন্ধকার নামেনি তখনও। এবার আস্তে আস্তে আলো কমবে। আমরা পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি মাঠ ভাঙি। অন্ধকার নামছে।

আবার ক্ষেত, আল হয়ে পুকুর পাড় দিয়ে শাল গাছেদের পাশ কাটিয়ে ঘরমুখো এগিয়ে যাই আমরা। পিছনে না তাকিয়েও বেশ বুঝতে পারি পুকুরের এ পাড়ের একলা শাল গাছটা হাঁটা লাগিয়েছে ওপারের বাকি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাবে বলে।

রফিকুর রশীদ

ইচ্ছে পুতুল

অনেকদিন পর গত রাত থেকে বকুলের মন ভাল হয়ে গেছে।

মনটা যে তার ভীষণ খারাপ ছিল এ কথাও সে মুখ ফুটে বাবাকে বলেনি কখনো। বাড়িতে যেমন এক নাগাড়ে কান্নাকাটি করত, তাও সে করেনি এখানে। মামাবাড়ির কারও বিরুদ্ধে তার কোন নালিশ নেই। ঢাকা শহরে হাঁপিয়ে উঠেছিল এ কদিনে, এমন কথাও সে প্রকাশ করেনি। কেবল বাবা যেদিন এ বাড়িতে এল, সেইদিনই সেই সন্ধ্যায় বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দু'চোখ বেয়ে নীরবে অশ্রু ঝরেছিল। দীর্ঘ পঁচিশ দিন পর বাবাকে দেখে ঐটুকু কান্না তো আসতেই পারে। মাত্র ঐটুকুই। ওতেই বাবা কী করে যে বুঝে নিলেন– বকুলের মন ভাল নেই। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চুলের মধ্যে বিলি কাটেন পাঁচ আঙুলে। কী যে মমতা মাখা সেই বিলি। মোমের মত গলে যায় বকুল। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, বাবাও তখন মুখে কোন কথা বলেন না। যা বলার তা বলেন ঐ আঙুলের ডগায়। ঐটুকু স্পর্শ থেকে অমনি সব বুঝে নিলেন– বকুলের মন ভাল নেই।

রাতে খাবার টেবিলে বকুলের লেখাপড়া এবং নতুন স্কুলে ভর্তি নিয়ে কথা ওঠে। গ্রামে বাবার স্কুলেই ক্লাস থ্রির ছাত্রী ছিল সে। রোল নম্বর দুই। এবারে ফার্স্ট হয়েই ক্লাস ফোর এ উঠবে– এই ছিল সবার প্রত্যাশা। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষাই দেওয়া হল না তার। পরীক্ষার দশ দিন আগে মাকে হারালে ফার্স্ট হওয়া তো পরের কথা, কেউ পরীক্ষায় বসতে পারে। এ জন্যে বকুলের বাবার মনে গোপন দুঃখ থাকলেও বকুলের বড় মামা এক কথায় সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, গ্রামের স্কুলের পরীক্ষা বা রেজাল্ট কোন ব্যাপারই না। শহরের স্কুলে এগুলো ধর্তব্যের মধ্যেই নেওয়া হয় না। ছোটবোনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ঢাকা থেকে আসার পর একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর চিকিৎসায় অবহেলার জন্যে বকুলের বাবাকে বিস্তর বকাবকি করে খানিকটা হাল্কা হলে মাতৃহারা মেয়েটির লেখাপড়ার কথা ওঠে এবং এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি একেবারে বদলে যান। অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে বকুলের গালে আদর করে বলেছিলেন– আমাদের বকুলকে ঢাকা শহরের ভাল স্কুলে ভর্তি করাব। ঢাকা শহরে যাওয়া, ভাল স্কুলে পড়া এসব লোভনীয় প্রস্তাবে বকুলের মন নতুন আশায় খানিকটা দুলে উঠেছিল বটে, তবু এই গ্রাম ছেড়ে যাবার বেদনাও বুকের মধ্যে খুব বিঁধছিল। ভাল স্কুল আর খারাপ স্কুল যাই-ই হোক, তৃষা আপুদের স্কুলে ভর্তি হলে সে পড়তে রাজি, মনে মনে এই পর্যন্ত ভেবে রাখে। বড় মামাও ঘাড় নেড়ে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন– তৃষাদের স্কুলের নিয়মকানুনই আলাদা, বুঝেছ মাস্টার। সে সব দেখলে এই মাস্টারী ছেড়ে তোমারও আবার ইচ্ছে হবে ওদের স্কুলের ছাত্র হতে। সেই স্কুলে ভর্তি করাব বকুলকে।

বকুলের বাবার নাম আব্দুল মান্নান। গ্রামের লোকে বলে মানা মাস্টার। বড় মামা সাধারণত পূর্ণ নামের উচ্চারণেই ডাকেন, ইচ্ছে হলে কখনো বা মাস্টার বলেন। খাবার টেবিলে বসে আর সেদিনের মত মাস্টার বললেন না, বেশ উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে বললেন,

– বকুলের ভর্তি নিয়ে যে ভারি সমস্যা হয়ে গেল আব্দুল মান্নান।

বকুলের বাবা সেই সমস্যা নিয়ে বিশেষ কৌতূহল না দেখিয়ে কেবল মুখ উচু করে তাকান। বড় মামাই বোঝাতে চেষ্টা করেন,

– তৃষ্ণাদের স্কুলটাতে হাজার গন্ডা নিয়মের কড়াকড়ি। এ বছরে আর ওখানে ভর্তি করানো যাবে না।

বকুলের বড় মামি কী ভেবে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন,

– হয়েছে নাও, এখন খেয়ে নাও দেখি। ও সব কথা পরে বললেও হবে। ঢাকা শহরে আরো বহু স্কুল আছে।

ভাত মাখতে মাখতে বড় মামা আবারও যোগ করেন,

– আমিও সেই কথাই বলছি। বকুলকে এবার সানফ্লাওয়ারে ভর্তি করাব। বাসা থেকেও খুব কাছে হবে। এই যে তিন নম্বর রোডের শেষ মাথায়, বুঝেছ মাস্টার। এটাও ভাল স্কুল।

বড় মামি বকুলের বাবার প্লেটে তরকারি তুলে দিতে দিতে আবার মৃদু ধমকে ওঠেন,

– বেশ তাই হবে। এখন খেয়ে নাও দেখি।

সবার খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে যায়। বড় মামা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বকুলের বাবার সঙ্গে আরো অনেক গল্প করেন। গ্রামের কথা। দেশের কথা। বকুল তখন তৃষার সঙ্গে বিছানায়। প্রতিদিনই তারা এক সঙ্গে শোয়। দু'জনের মাঝখানে থাকে কিটি। শ্বেত শুভ্র তুলতুলে এক পুতুল। আকৃতিতে প্রায় দু'জনেরই সমান। এই পুতুল ছাড়া নাকি তৃষার ঘুম আসে না। দু'এক দিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে গেলেও তৃষা তাই কিটিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। দু'বছর আগে বকুলদের বাড়িতে যেবার বেড়াতে গিয়েছিল সেবারও সঙ্গে একটা পুতুল ছিল। তবে সেটা এই কিটি নয়। গায়ের রং ছিল ভিন্ন, আকৃতিতেও ছিল অনেক ছোট। কিটির গায়ের রং সাদা ধবধবে। আর সত্যি বলতে কি, লম্বায় এত বড় পুতুল, কিটিকে দেখার আগে বকুল কখনো দেখেনি। বকুলেরও পুতুল খুবই প্রিয়, গ্রামে মাটি দিয়ে কাদা মেখে সেও অনেক পুতুল বানিয়েছে। কিন্তু সেগুলো কি আর এই কিটির মত দেখতে। শুধু কি রূপের বাহার, কিটির আরো বিরাট গুণ আছে। তৃষা আপুতো কিটিকে বলে 'উইশ ডল।' ইচ্ছে পুতুল। মনের ইচ্ছেগুলো ঠিক মত জানাতে পারলেই সে নাকি ইচ্ছেপূরণ করে দেয়। ক্লাসের পড়া মুখস্থ করার ইচ্ছে, কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে– সব নাকি কিটি বুঝতে পারে এবং তৃষা আপুর সব ইচ্ছে নাকি সে পূরণ করে দেয়। তবে তার জন্যে কিটির মনটা আগে বুঝতে হবে। ওর যদি মন খারাপ থাকে তাহলে কারো কোন ইচ্ছেই পূরণ হবে না। এ সব কথা বহুবার শুনেছে বকুল, বিশ্বাস করতে চেষ্টাও করেছে; কিন্তু তার মোটেই বিশ্বাস হয়নি। রাজীব ভাইয়াও তাকে গোপনে জানিয়েছে– মাথা খারাপ! কিটি হোক আর বিটি হোক, পুতুল হচ্ছে পুতুলই। তৃষার মাথায় নির্ঘাৎ পোকা আছে, তাই কিটিকে নিয়ে থাকে। কিন্তু সেই পোকা যেন তোর মাথায় ঢুকে না যায়। তারপর থেকে বকুল ভয়ে ভয়ে থেকেছে– বিদ্‌ঘুটে সেই পোকাটা না সত্যি সত্যি তার মাথায় ঢুকে যায়! কিটির ঘাড়ে হাত রেখে আদুরে ভঙ্গিতে তৃষা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। ঘুম আসে না বকুলের চোখে। এপাশ ওপাশ করে। বালিশ উল্টিয়ে নেয়। চোখ বন্ধ করে এক থেকে একশ' পর্যন্ত, আবার একশ' থেকে উল্টো করে এক পর্যন্ত গুনে আসে। তবু ঘুম আসে না। ঘুমনোর এই কৌশলটি তাকে শিখিয়েছিল ছোট মামা। কিন্তু সে কৌশলও ব্যর্থ হবার পর সে পিট্‌পিট্ করে চোখ মেলে তাকায়। ঘরের মৃদু আলো চোখসওয়া হয়ে গেলে সে দেখতে পায়– কিটির ঘাড়ের উপর থেকে তৃষার ডান হাত কখন আলগোছে সরে গেছে। আর কিটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নীল চোখের মণি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। প্রথম দিকে বেশ কদিন ঐ চোখের দিকে তাকালে তার ভয়ানক অস্বস্তি হত, গা শিরশিরানো ভয় করত। পরে সেই অস্বস্তি কেটে গেছে। এখন বরং মাঝে মধ্যে কিটির চোখে চোখ



রেখে গভীরভাবে তাকাতে চেষ্টা করে। আর সেটা করতে গিয়েই কিটির উপরে মায়া পড়ে গেছে। এখন চোখের গভীরে চোখ রাখলেই তার মনে হয় কিটি তাকে বুঝতে পারছে, তার মনের ইচ্ছেটা ধরতে পারছে। কিটির গালে হাত বুলিয়ে সে একটুখানি আদর করে দেয়। আর তক্ষুনি চাপা কণ্ঠে ডাক শুনতে পায়,

– বকুল!

বকুল কান খাড়া করে। চোখ মেলে দেখে, মাথার কাছে তার বাবা দাঁড়িয়ে। নিজের চোখ-কানকেই যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সে তো এইমাত্র চোখের ভাষায় কিটিকে তার মনের কথা জানিয়েছে, এরই মাঝে বাবা এসে হাজির! মাথার চুলে আস্তে করে হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করেন,

– ঘুমিয়ে গেছিস বকুল?

বকুল তড়াক করে লাফ মেরে উঠে বসে,

– না বাবা, ঘুম আসছে না।

– আয়, আমার কাছে ঘুমুবি আয়।

আনন্দে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয় বকুলের। এরই মধ্যে এই ইচ্ছেটাও তাহলে পৌঁছে গেছে! কৃতজ্ঞতায় ছলছলানো চোখে একবার কিটির দিকে তাকায়। তারপর বাবার কোলে লাফিয়ে পড়ে।

বাবার কাছে এসে শোবার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টেরই পায়নি বকুল। মাথার চুলে বাবার ডান হাতের পাঁচ আঙুলের বিলি কাটার কথা আবছা মনে পড়ে। তারপরই ঘুম। টানা এক ঘুমে রাত কাবার। সকালে উঠেই এই সুসংবাদ জানতে পারে যে, তার বাবা তাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা আজই। আবারও গায়ে কাঁটা দেওয়া অবিশ্বাস জাগে, আবারও কিটির মুখ মনে পড়ে যায়। বকুলের মনের এত কথা কখন কীভাবে টের পেলে গেল কিটি! ভারি অবাক করা কান্ড তো! গত রাতেই আলোচনা হল– তাকে এবার সানফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তি করা হবে। এ সিদ্ধান্তে সে খুশি হয়েছে কি হয়নি, সে কথা তো সে কাউকে বলেনি! তবু বাবা সব টের পেয়ে গেল! আর অমনি ঐ রাতের মধ্যে বড় মামার সিদ্ধান্ত একেবারে উল্টেপাল্টে লন্ডভন্ড! কিটিকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পায় না বকুল। আর ঐ ঘরে ঢুকে ধন্যবাদ জানাতে গেলেই তো রাজীব ভাইয়া টের পেয়ে যাবে! সে তো কিটিকে আদৌ বিশ্বাস করে না! অবশ্য প্রথম দিকে বকুলেরও বিশ্বাস ছিল না, এ জন্যে ভেতরে সে লজ্জা পায়।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় বাড়ি যাবার তোড়জোড়। বড় মামি নিজে হাতে সব গোছগাছ করে দেন। ঢাকায় আসার পর বকুলকে তিনটি নতুন জামা কিনে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ভালটা পরিয়ে বকুলকে সাজিয়ে দেন। চুলের মধ্যে চিরুনি চালাতে চালাতে বলেন,

– শোন মেয়ে, ভালয় ভালয় ফাইভটা পাশ করে নাও। তারপর আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। সেবার আর তোমার বাপের কোন কথা শুনব না।

বকুলের বাবা সঙ্গে সঙ্গে হাত কচলে আপত্তি জানায়,

– ভাইজানের সঙ্গে কিন্তু অন্য কথা হয়েছে ভাবী। ম্যাট্রিক পাশের পর আমিই বকুলকে এখানে রেখে যাব।

– তুমি থাম দেখি!

মৃদু বকুনিতে বকুলের বাবা চুপ করে যান বটে, তবু বড় মামির গজগজানি থামে না– অমনি এসে বায়না ধরলে আর মেয়েটাকে নিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চললে! মেয়েটা এখন কার কাছে থাকবে, কীভাবে মানুষ হবে সে চিন্তা আছে!

বকুলের হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়। সকালবেলার সব আনন্দ সহসা নিভে যায়। বাড়ি গিয়ে চাচা-চাচী, চাচাত ভাইবোন সবাইকে পাবে, দাদীবুড়িকে পাবে; কিন্তু তার মাকে আর কিছুতেই ফিরে পাবে না– এই কথা মনে পড়তেই দু'চোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। বাড়ি যাবার আনন্দ সহসা পান্‌সে হয়ে যায়। এরই মধ্যে হঠাৎ তৃষা এসে দুম্ করে প্রশ্ন করে,

– বকুল তুই সত্যি বাড়ি চলে যাবি?

ঘুম থেকে দেরিতে উঠে বকুলের বাড়ি যাবার খবর শুনে হয়তো তার মনেও খট্‌কা লেগেছে, কষ্ট পেয়েছে, তাই ছুটে এসে এই প্রশ্ন করে। কিন্তু কোন উত্তর দেওয়া হয় না এই প্রশ্নের। বকুল এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বড় মামি তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। তৃষা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে রওনা হবার মুহূর্তে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বকুল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়। সবার মধ্যে থেকে তৃষাকে আলাদা করে নিয়ে প্রস্তাব দেয়,

– তৃষা আপু, তোমার কিটিকে একটুখানি আদর করতে দেবে?

তৃষা ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘর থেকে কিটিকে কোলে তুলে নিয়ে আসে। কিটির সারা গায়ে বকুল হাত বুলায়, গালের সঙ্গে গাল ছোঁয়ায় পরম মমতায়। তারপর চোখে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে যায়– কিটির চোখেও জল নাকি!

কিটির জন্যে বকুলের এত ভালবাসা তৃষা কখনো দেখেনি। সে খুব অবাক হয়। কিটিকে ফিরিয়ে দেয় বকুল। নিতে খুব খারাপ লাগে। তবু কোলের মধ্যে কিটিকে নিয়ে সে জানায়,

– তোর জন্যেও খুব সুন্দর একটা উইশ্‌ডল কিনে রাখব দেখিস! এবার এলেই তুই সেটা পেয়ে যাবি।

একেবারে কিটির মত না হোক, বাবার কাছে একটা ইচ্ছে পুতুলের বায়না জানানোর পরিকল্পনা আগে থেকেই করে রেখেছিল বকুল। কিন্তু সময়ের অভাবে সেই সুযোগই পাওয়া গেল না। সকাল ন'টায় গাবতলী থেকে বাস ছাড়বে, দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে বাবার মাথায় টেনশন। শেষ পর্যন্ত বাস পাওয়া গেল ঠিক মতই। জানালার পাশে বকুলকে বসিয়ে ওর বাবা রাস্তার দু'পাশের নানান কিছুর পরিচয় করিয়ে দিতে থাকেন। জাতীয় স্মৃতি সৌধ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মিরপুর ব্রিজ– আরো কত কিছু! ধীরে ধীরে বকুলের মনের ভেতরটা আবার ফুরফুরে হয়ে যায়। বাবার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে। এটা কী ওটা কী জানতে চায়। আরিচা ঘাটে এসে ফেরিতে ওঠার পর বকুলের বাবা জানান,

– জানিস বুড়ি, তুই চলে আসার পর থেকে তোর দাদী শুধু কাঁদে।

বকুল অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকায়। দাদীকে সে দাদীবুড়ি বলে, দাদীও তাকে বুড়ি বলে ডাকে। কিন্তু এ নামে তাকে আর কেউ কখনো ডাকে না। বাবার মুখে সেই নাম শুনে প্রথমে চমকে ওঠে। কিন্তু দাদীবুড়ি তার জন্যে কাঁদে এ কথা বিশ্বাস হতে চায় না। বরং তার ধারনা, সে তো তাকে দু'চোখের কোণায় দেখতেই পারে না। শুধু বকুল বলে নয়, কোন নাৎনিকেই তার পছন্দ নয়। তার পছন্দ হচ্ছে নাতি, বড় চাচার ছেলে হেলাল তার সব চেয়ে প্রিয়পাত্র। সে তো বাড়িতেই আছে! বকুলের জন্যে কাঁদবে কেন! যেদিন বড় মামা এসে তাকে ঢাকায় নিয়ে গেল, সেদিন তো কই বাধা দেয়নি!

নদী পেরিয়ে বাস আবার চলতে শুরু করে। বাবার মুখের দিকে দু'একবার তাকায়, কিন্তু দাদীবুড়ির কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। এক সময় এমনও মনে হয়, মায়ের মৃত্যুর জন্যেও বুঝিবা এই দাদীবুড়িই দায়ী। দিনরাত তার মুখে একই গাওনা– 'দেখিস এবার তোর ভাই হবে।' সেই ভাই হবার যখন সময় হল, মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে, দাদীবুড়ি তবু হাসপাতালে যেতে দেবে না; সবার আগে নাতিকে কোলে নেওয়ার সুযোগটা যদি ফসকে যায়! কী আহ্লাদ! শেষে রিক্সাভ্যানে চেপে হাসপাতালেই যাওয়া হল, কিন্তু মাকে অথবা অনাগত সেই ভাইকে আর পাওয়া গেল না। বকুলের অন্তর জ্বলে যায়, দাদীবুড়ির উপর থেকে রাগ কিছুতেই পড়ে না।

শেষ বিকেলের আলোয় বাড়ি এসে পৌঁছুতেই দেখা গেল, সবার আগে দাদীবুড়িই তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে একাকার। বুকের মধ্যে থেকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কান্না ও থামে না। বরং সে কান্না অতিক্রত বকুলকে ও সংক্রামিত করে।

রাতে বকুলের শোওয়া নিয়ে সংকট দেখা দেয়। দাদীবুড়ির বিছানা সব সময় থাকে হেলালের দখলে। অথচ তার প্রবল ইচ্ছে জেগেছে, আজ থেকে সে বকুলকেই সঙ্গে নেবে। এদিকে চাচাত ভাইবোনেরা দাবি জানায়, বকুলকে নিয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে থাকবে। শোওয়া নিয়ে এই কাড়াকাড়ি বকুলের ভালই লাগে। তবু সে চুপচাপ উঠে গিয়ে বাবার কাছে শুয়ে পড়ে। সবার টানাটানি দেখে ডাকতে সাহস পাননি বটে, কিন্তু বকুলের এই নিজস্ব সিদ্ধান্ত বকুলের বাবার বুকটা জুড়িয়ে দেয়। পরম মমতায় মেয়ের কপালে, চোখের পাতায় হাত বুলিয়ে দেন। এক সময় খুব আস্তে করে জিগ্যেস করেন,

– আজ তোর ঘুম আসবে তো বুড়ি?

– হুঁ। ছোট্ট জবাবে সম্মতি জানায় বকুল।

কিন্তু সত্যি সত্যি ঘুম আসতে বেশ দেরি হয়। বকুল দু'বার পাশ ফিরে শোয়। তার বাবা গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ আবিষ্কার করেন, বকুলের ডান হাতের মুঠো বন্ধ। সেখানে এসে হাত ঠেকতেই বকুল আরো শক্ত করে মুঠো বন্ধ করে বুকের কাছে চেপে ধরে। বাবা ভীষণ বিস্মিত হয়ে জানতে চান,

– তোর হাতের মুঠোয় কী মা?

বকুল নিরুত্তর। বাবা আরো কোমল কণ্ঠে অনুযোগ করেন,

– আমাকে বলবি না?

– তুমি বকবে না তো!

– না। একদম না।

হাতের মুঠো আল্‌গা করে বকুল। অবাক বিস্ময়ে বাবা দেখতে পান, ছোট্ট একটি মাটির পুতুল। এই পুতুল খেলার জন্যে তিনি অনেক সময় বকাবকি করেছেন, নেবুতলায় পাতা পুতুলের সংসার থেকে তুলে এনে বকুলকে পড়তে বসিয়েছেন। কিন্তু ওর মা ঠিকই আস্কারা দিয়েছে। তাই বলে এতদিন পর হাতের মুঠোয় সেই পুতুল নিয়ে ঘুমুতে হবে। এই খামখেয়ালির কোন অর্থ খুঁজে পান না বকুলের বাবা সোজাসুজি প্রশ্ন করেই বসেন,

– রাতের বেলায় কেউ পুতুল নিয়ে খেলে মা? এটা তুই তোথায় পেলি?

– আমি খেলছি না তো!

পুতুলটাকে দিব্যি হাতের মুঠোয় পুরে বকুল জানায়,

– এটা আমার মা আমাকে বানিয়ে দিয়েছে। এটাই আমার উইশ ডল।

বকুলের বাবার বিস্ময় বেড়ে যায়,

–উইশ ডল মানে?

– উইশ ডল মানেও জান না? ইচ্ছে পুতুল। যা ইচ্ছে করবে, তাই পূরণ হবে। তৃষা আপুর যেমন কিটি আছে, আমার তেমন এটাই কিটি। বুঝেছ?

এরপর বকুল শুরু করে কিটির গুণাগুণ ও কর্মক্ষমতার বিস্তারিত বিবরণ। রাজীব ভাইয়া এসব বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছিল সে কথাও জানায়। কিন্তু সে যে নিজেই হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছে। তার বেলা? গত রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত কী কী প্রমাণ পেয়েছে সে সব ও খুলে বলে। ইচ্ছে পুতুলের কথা শুনতে শুনতে বকুলের বাবার চোখে জল এসে যায়। মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে জিগ্যেস করেন,

– ইচ্ছেপুতুলের কাছে আজ তুই কী ইচ্ছে জানিয়েছিস মা?

অত্যন্ত সহজভাবে স্বীকার করে বকুল,

– আজ আমার মাকে স্বপ্নে দেখতে চাই।

মেয়ের এই ইচ্ছের খবর জানার পর বাবার মুখে আর কথা সরে না, পিঠে হাত বুলানো থেমে যায়। খুব নিভৃতে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অনেকক্ষণ পর ছোট্ট শিশুর মত আবদার জানান,

– তোকে আমি কিটির চেয়ে ভাল পুতুল কিনে দেব। তোর স্বপ্নের অর্ধেক ভাগ দিবি আমাকে?

বকুল মজা পেয়ে হেসে ওঠে,

– ধ্যাৎ! স্বপ্নের আবার ভাগ হয় নাকি!

কবিতা ছড়া

তরুণকান্তি বারিক

ভেবে দেখো

ভেবে দেখো রোববারও কেন ঘুম ভেঙে যায় ভোরে
ভেবে দেখো ভূতেরা কী লোভে বাঁশবাগানেই ঘোরে।
ভেবে দেখো ছোটবেলাটায় তুমিও ছিলে কি বিচ্ছুটাই
কেন যোগ-গুণ-ভাগেও শূন্য, পেলে না কিচ্ছুটাই।
ভেবে দেখো বইয়ে মাথা রেখে কতবার ঘুমে কাদা
না পারা অঙ্ক কত সহজেই মিলিয়ে দিয়েছে দাদা।
ভেবে দেখো ফুটবল মাঠে তোমরাই কেন খেলে গোল
হাসলেই কেন বিনুটার গালে উঁকি দিয়ে যায় টোল।
ভেবে দেখো লুডোর ঘুঁটি কতবার গিলেছে সাপের মুখ
তিন বিঘে দীঘি সাঁতরাতে হলে কতটা তৈরি বুক।
ভেবে দেখো ছাদের আকাশে ঘুড়িদের কাটাকুটি
ভারী বৃষ্টিতে পড়ে পাওয়া খিচুড়ি-ইলিশ ছুটি।
ভেবে দেখো অকারণ কত মিছে কথাদের ভিড় মুখে
ভেবে দেখো ঠুনকো কারণে কেন চিড় ধরে সুখে।
ভেবে দেখো তোমার জ্বরে মা'র চোখে ঘুম ফরসা
কেন নিজের বাড়িতে সবচেয়ে সুখ, সবটুকু ভরসা।
ভেবে দেখো কেন ফুল ফোটে সব চোখের আড়ালেই
কেন কালো হিংসাও মুছে সাফ বন্ধুর হাত বাড়ালেই।
ভেবে দেখো ইসকুলে রোজ কার সাথে টিফিনের ভাগ
ঠাকুমার কোলে মাথা গুঁজে গুলে জল হয়ে যায় রাগ।
ভেবে দেখো কেন তীরে ভাঙে ক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউ
কথা দেয় তিন-সত্যির, তবু তা রাখে না কেন কেউ।
ভেবে দেখো কচ্ছপও হায় কেন জিতে যায় লং-রেসে
ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ কতদূর গিয়ে আকাশের গায় মেশে।
ভেবে দেখো কোথা থেকে পেল পরীরা ওড়ার ডানা
কোথা থেকে এসে স্বপ্নেরা সব মগজেই দেয় হানা।
ভেবে দেখো, ভেবে দেখা যায় আরও কত কিছুটাই
কিছু তার জানা আছে, বাকিটার খোঁজ রাখা চাই।





শিশুদের ভবিষ্যৎ থাক সোনায় মোড়া



জনৈক শুভার্থী